বৈজ্ঞানিকী

—ঃ*ঃ—

রায়সাহেব
শ্রীজগদানন্দ রায়

চতুর্থ সংস্করণ

———

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্, এলাহাবাদ
১৩৫৯

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

উৎসর্গ

সাহিত্যের
উন্নতিবিধানে,
ভাবে ও কর্ম্মে যিনি
দেশে নবপ্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন,
বর্ত্তমান ভারতের সেই দীপ্তসূর্য্য মহাকবি ও মনীষী
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
শ্রীচরণ-সমীপে আজ পাঁচফুলে সাজানো এই
সাজিখানি রাখিলাম। ফুলগুলি গন্ধ
ও বর্ণহীন, দীন ভক্তের অর্ঘ্য
বলিয়া তিনি প্রসন্ন দৃষ্টি
দান করিলে
এগুলি
ধন্য হইবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়

নিবেদন

যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পাইল, তাহাদের কতকগুলি পূর্ব্বে "প্রবাসী", "বঙ্গদর্শন", "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটি নূতন রচনাও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "অবৈজ্ঞানিক" পাঠক-সাধারণ যাহাতে আলোচিত তত্ত্বগুলিকে অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারেন, প্রবন্ধ রচনাকালে সর্ব্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি; ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুধী পাঠক বিচার করিবেন।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সূচী

বৈজ্ঞানিকী

—:০:—

দেহশত্রু ও দেহমিত্র

পীড়িত হইলে আমরা ডাক্তার-কবিরাজ ডাকি, ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া লই, দর্শনী দিই, ঔষধ সেবন করি, হয় ত সারিয়া যাই; ইহাতে ডাক্তার মহাশয়ের জয়-জয়কার হয় এবং লোকটি যে বিচক্ষণ চিকিৎসক, বাড়ীর লোকে, পাড়ার লোকে তাহা বুঝে। কিন্তু এমনও ত দেখা যায়, নিঃসহায় দরিদ্র লোকে পীড়িত হইয়াছে, পীড়া খুবই কঠিন, কিন্তু দর্শনী দিয়া চিকিৎসক ডাকে বা ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ কিনিয়া খায়, এমন সামর্থ্য তাহার নাই। ক্ষুদ্র কুটীরে সে কিছুদিন পড়িয়া থাকে, তা'র পর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ডাক্তার আসিলেন না, কবিরাজও আসিলেন না, অথচ রোগী রোগমুক্ত হইল। কাজেই, স্বীকার করিতেই হয়, মানুষের দেহের ভিতরে এমন কোন সুব্যবস্থা আছে, যাহাতে রোগী কোন চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতীত রোগ মুক্ত হইতে পারে। মানুষের কথা ছাড়িয়া দিলে, ইতর প্রাণীতে এই ব্যাপারটা আরো সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে ডাক্তার-কবিরাজ নাই, অথচ রোগ আছে। রোগ হইলেই ইহাদের মৃত্যু হয় না,—কিছুদিন অসুস্থ থাকিয়া আপনা হইতেই ইহারা সুস্থ হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা হউক, শরীরের কোন্ বিশেষ ধর্ম্মে, কি প্রকারে চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতীত আমরা নীরোগ হই, এই রহস্যটির আবিষ্কারের জন্য বহু

দিন ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টা আজও সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে শরীরতত্ত্বের যে সকল রহস্য একে একে ধরা পড়িতেছে তাহা বড়ই অদ্ভুত।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে জেনার্ (Jenner) নামক জনৈক চিকিৎসক বসন্তরোগের চিকিৎসায় গোবীজের টিকা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে অদ্ভুত ফল দেখা গিয়াছিল। যে এই টিকা লইত তাহার আর বসন্ত হইত না। এই ঘটনার পর এক শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, বসন্ত রোগের আক্রমণ নিবারণের জন্য জেনার্ সাহেবের সেই উপায়ই প্রচলিত আছে। যাহা হউক, ইনি যখন টিকা দিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া করেন নাই, নানা পরীক্ষার মধ্যে এইটিকেই সফল হইতে দেখিয়া টিকা দিবার প্রথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। একটু সামান্য গোবীজ দেহস্থ করিলে কি প্রকারে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তৎকালিক বড় বড় চিকিৎসকেরাও স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু সকলেক এক একটু বুঝিয়াছিলেন, পীড়ানাশের অস্ত্র কেবলই ঔষধের পুঁটুলি ও আরকের শিশিতে নাই, বিধাতা যেদিন প্রাণীর দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেদিন প্রাণরক্ষার উপায়টাও দেহে যোজনা করিয়া দিয়াছেন।

জেনারের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আর কোন নূতন ঘটনা ঘটে নাই। ইহার পরে সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত পাষ্টুর (Pasteur) আরোগ্যতত্ত্বের উপর এক নূতন আলোকপাত করিয়াছিলেন। ইনি নিজে চিকিৎসক ছিলেন না, কিন্তু বিখ্যাত চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগের শত আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, দধিবীজ দিলে দুগ্ধ যেমন গাঁজিয়া উঠে, তেমনি দেহে ব্যাধিবীজ প্রবেশ করিলে ঐ প্রকার এক গাঁজানো (Fermentation) সুরু হয়। ব্যাধির যে আবার বীজ আছে চিকিৎসকগণ তাহা এই প্রথম শুনিলেন, এবং তাহা

দেহে প্রবেশ করিলে যে গাঁজানো সুরু হয়, তাহাও সর্ব্বপ্রথমে এইমাত্র তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল।

পাষ্টুর সাহেব এই আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ব্যাধিবীজ সংগ্রহ করিয়া তিনি নানা ইতর প্রাণীর শরীরে তাহা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। প্রাণিদেহে ব্যাধি দেখা দিতে লাগিল। তা'র পর এই সকল প্রাণীর দেহ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া অপর প্রাণীর শরীরে তাহা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বার বার এই প্রকার করায় দেখা গেল, বীজের শক্তি ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। পাষ্টুর এই হতবীর্য্য বীজ মানবদেহে প্রয়োগ করিয়া কি ফল পাওয়া যায় দেখিবার জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। দেখা গেল, মানবদেহে পীড়ার অতি সামান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইল, কিন্তু ব্যাধির এই সামান্য আক্রমণ দ্বারা দেহটি চিরকালের জন্য সেই ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া গেল। হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্করোগের চিকিৎসাপদ্ধতি পাষ্টুর সাহেব ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রথায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একে একে বহু ইতর প্রাণীর শরীরে বার বার প্রয়োগ করার পর হাইড্রোফোবিয়ার যে ক্ষীণ-বীর্য্য বীজ পাওয়া যায়, তাহার টিকা লইলে মানুষকে এখন আর জলাতঙ্করোগের ভয়ে ভীত হইতে হয় না।

যাহা হউক, ঔষধ সেবন ছাড়া রোগমুক্তির যে আরো উপায় আছে, পাষ্টুর সাহেবের ঐ আবিষ্কার দ্বারা সুবুদ্ধি চিকিৎসকগণ তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং যখন বিনা চিকিৎসায় লোকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হয়, তখন হয় ত দেহের ভিতরে ঐ প্রকার কোন চিকিৎসা স্বভাবতঃ চলে বলিয়াও কাহারো কাহারো মনে হইয়াছিল।

অনেকে ভাবিয়াছিলেন, অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাপণ্ডিত পাষ্টুরের মৃত্যুর পর বুঝি ব্যাধিতত্ত্বের গবেষণা শেষ হইয়া যাইবে।

কিন্তু তাহা হইল না, পাষ্টুরের শিষ্যবর্গ গুরুপ্রদর্শিত পথে বহু পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নিত্য নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারে জগৎ চমকিত হইতে লাগিল। ইঁহারা দেখিলেন, প্রাণিশরীরে বার বার পীড়াবীজ প্রবেশ করাইয়া তাহা ক্ষীণবীর্য্য করার যে পদ্ধতি গুরু পাষ্টুর অবলম্বন করিয়াছিলেন, পীড়ানিবারণে তাহার প্রয়োজন নাই। পীড়াবীজ দেহে প্রবেশ করাইয়া পীড়ার নিবারণ না করিলেও চলে। ইঁহারা পর পর বহু ইতর প্রাণীর শরীরে প্রয়োগ করিয়া বীজগুলিকে হতবীর্য্য করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বশেষে যে প্রাণীর শরীরে এই বীজ জন্মিল, তাহার দেহ হইতে বীজ গ্রহণ না করিয়া রক্তের লালাবৎ স্বচ্ছ অংশটা (Serum) মানবদেহে প্রবিষ্ট করিতে লাগিলেন। ইহাতে অদ্ভুত ফল পাওয়া গেল। পাষ্টুরের প্রথায় হীনবীর্য্য ব্যাধি-বীজ শরীরে প্রবেশ করাইলে যেমন দেহে পীড়ার মৃদু লক্ষণ প্রকাশ পাইত, ইহাতে তাহা দেখা গেল না। অথচ এই রক্তলালার (Serum) টিকা লইবামাত্র লোকে ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে লাগিল। পাষ্টুরের শিষ্যবর্গ প্রচার করিতে লাগিলেন, এই রক্তের স্বচ্ছ লালার সহিত ব্যধিঘ্ন পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ইহা মানুষের প্রস্তুত নয়, প্রাণীকে ব্যাধিমুক্ত করিবার জন্য স্বয়ং প্রকৃতিদেবী দেহের কর্ম্মশালায় তাহা প্রস্তুত করেন, কাজেই, এই জিনিষটা কোনপ্রকারে সংগ্রহ করিয়া একবার দেহস্থ করিতে পারিলে, সেই পীড়ার আক্রমণের আর ভয় থাকে না। এই ব্যাধিঘ্ন রক্তলালা অ্যাণ্টিটক্সিন্ নামে পরিচিত।

ডিপথেরিয়া একটি ভয়ানক রোগ; ইহার বীজ মানবদেহ আশ্রয় করিলে আর নিস্তার থাকে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নানা ইতর প্রাণীর শরীরে ঐ বীজ পর পর প্রবেশ করাইয়া শেষে ঐ সকল প্রাণীর রক্তের লালায় আজকাল ডিপথেরিয়া রোগের যে চিকিৎসা হইতেছে, তাহা পাষ্টুরের শিষ্যবর্গই প্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন। স্থূল কথায়, এখনকার

সিরো-থিরাপি (Sero-theraphy) নামক চিকিৎসাপদ্ধতি এই সময়েই পাষ্টুরের শিষ্যবর্গকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পাষ্টুর সাহেব পীড়ার কারণ আবিষ্কার করিতেই জীবন অতিপাহিত করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ আরোগ্যলাভের এক উপায় আবিষ্কার করিলেন, কিন্তু বিষঘ্ন রক্তলালা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, এবং মানব-দেহে প্রবেশ করাইলে উহা কি প্রকারেই বা দেহকে ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, সেই সময় তাহা নির্ণীত হইল না। এই তত্ত্বাবিষ্কারের ভার আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের উপর দিয়া ইঁহারা অবসর গ্রহণ করিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ রুষ বৈজ্ঞানিক মেসনিকফের (Metchnikoff) বিশেষ পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। ইনি বর্ত্তমানকালে নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানকে যে কত উন্নত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লোকে ইহার নামই জানিত না। এই কয়েক বৎসর নীরবে গবেষণা করিয়া এখন তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন।

ত্রিশ, বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি একটি বিশেষ বিষয়, লইয়া পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। শরীরের কোন স্থানে ফোড়া হইলে, বাআঘাত লাগিলে স্থানটি কেন স্ফীত হয় ইহাই তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, প্রাণীর রক্ত দেখিতে লাল হইলেও উহার সকলই লাল নয়। এক-প্রকার স্বচ্ছ লালায় ভাসমান অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত কণিকা এবং শ্বেত কণিকা লইয়াই রক্ত। রক্তে ঐ লোহিত কণিকাগুলি পরিমাণে অধিক থাকে, এবং এগুলির রঙটাও খুব জমকালো, এজন্য রক্তকে লোহিত দেখায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া তাজা রক্ত পরীক্ষা করিলে এই ভ্রম ভাঙিয়া যায় ; তখন রক্তে শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকা উভয়ই ধরা পড়ে। মেসনিকফ সাহেব শরীরের স্ফীতি পরীক্ষা করিতে গিয়া

দেখিয়াছিলেন, স্ফীত স্থানের চারিদিকে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহাতে শ্বেত কণিকার সংখ্যাই অধিক।

কেবল ইহাই নহে, তিনি আরো দেখিলেন, ঐ সকল শ্বেতকোষ স্ফীতস্থানের পীড়ার জীবাণুগুলিকে ক্রমাগত গ্রাস করিতেছে এবং হজম করিয়া ফেলিতেছে। স্পষ্টই বুঝা গেল, পীড়াবীজ নষ্ট করাই রক্তের শ্বেতকোষের কার্য্য ; কঠিনরোগে অঙ্গবিশেষের স্ফীতিতে যে রোগী মৃত-প্রায় হইয়াছে, তাহার রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, সেখানেও শ্বেত-কোষের সহিত পীড়ার জীবাণুর তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, কিন্তু শ্বেত-কোষের তুলনায় জীবাণুর সংখ্যা অধিকতর হওয়ায় সংগ্রামে শ্বেতকোষই পরাজিত ও মৃত হইয়া পড়িতেছে। কাজেই, জীবাণুর আধিক্যে রোগী মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

মেস্‌নিকফের এই আবিষ্কারে শরীরতত্ত্বে এক নূতন অধ্যায় যোজিত হইল। তিনি প্রচার করিলেন,—শ্বাসপ্রশ্বাস ও খাদ্যপানের সহিত সর্ব্বদাই নানারোগের জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করিতেছে এবং রক্তের সহিত যুক্ত হইতেছে। রক্তের শ্বেতকোষই এই জীবাণুগুলিকে গ্রাস করিয়া আমাদিগকে সুস্থ রাখিতেছে এবং যেখানে জীবাণুকে পরাভব করা শ্বেতকোষের সাধ্যাতীত হইতেছে, সেইখানেই আমরা পীড়িত হইতেছি এবং শেষে মৃত্যুমুখে পড়িতেছি। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জেনারের গোবীজের টিকা আবিষ্কারের পর হইতে, বৈজ্ঞানিকগণ যে রহস্যটি জানিবার জন্য বহু পরীক্ষা করিতেছিলেন, মেস্‌নিকফ্ তাহা প্রকাশ করিলেন। প্রকৃতিদেবী কি প্রকারে তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানগুলিকে ব্যধির কবল হইতে রক্ষা করেন, সকলে তাহার আভাস পাইলেন।

কোন নবতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবামাত্রই সহজে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। আবিষ্কারককে বহু তর্ককোলাহল ও বাগ্‌বিতণ্ডার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয় এবং সময়ে সময়ে প্রতিপক্ষের নিকট বহু নির্য্যাতনও

ভোগ করিতে হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাভেসিয়ার্ ও গ্যালিলিয়ো কি প্রকারে নিজেদের প্রাণ দিয়া নব সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজন। নিউটন্ ও ডারউইন্‌কেও প্রতিপক্ষের হস্তে নানাপ্রকারে বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল। মেস্‌নিকফের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইলেও কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—স্বীকার করা গেল যে, রক্তের শ্বেতকণিকাগুলিই পীড়ার জীবাণু নষ্ট করে কিন্তু পীড়িত প্রাণীর দেহ হইতে রক্তের লালা (Lymph) লইয়া পাষ্টুরের শিষ্যগণ যে নূতন চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, মেস্‌নিকফের সিদ্ধান্তে তাহার ব্যাখ্যান কোথায়?

মেস্‌নিকফ্ তাঁহার সিদ্ধান্তটিকেই অবলম্বন করিয়া এই প্রশ্নের সদুত্তর দিবার জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন, এবং দেখিলেন, পাষ্টুরের শিষ্যগণ ইতর প্রাণীর দেহে পীড়ার জীবাণু প্রবেশ করাইয়া এবং পরে তাহারই দেহের রক্ত-লালার (Serum) টিকা দ্বারা যে চিকিৎসা করিতেছেন, তাহার মূলেও রক্তের সেই শ্বেতকোষের কার্য্য বর্ত্তমান। দেখা গেল, এই কোষগুলি পীড়িত দেহস্থ জীবাণুগুলিকে গ্রাস করিয়াই নিরস্ত হয় না; যখন বিশেষ বিশেষ পীড়ার জীবাণু রক্তে সঞ্চিত হইয়া অনিষ্ট করিতে থাকে, সেই সময়ে এই শ্বেত কোষগুলি হইতে আপনা হইতেই এক প্রকার বিষঘ্ন রস নির্গত হইতে থাকে। আমাদের যকৃৎ হইতে যেমন পিত্তরস এবং পাকাশয় হইতে যেমন পেপ্‌সিন্ ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ আপনা হইতেই নির্গত হয়, শ্বেতকণিকা হইতে বিষঘ্ন রস নির্গমন কতকটা সেই প্রকারেই চলে। মেস্‌নিকফ সুস্পষ্টরূপে দেখাইলেন, এই বিষঘ্ন পদার্থও জীবাণুকে নষ্ট করে। কাজেই, পাষ্টুরের শিষ্যগণের আবিষ্কৃত টিকার কার্য্যের একটা সদ্ব্যাখ্যান পাওয়া গেল। মেস্‌নিকফ সাহেব বলিতে লাগিলেন, যে সকল ইতর প্রাণীকে আমরা

কৃত্রিম উপায়ে ব্যাধিগ্রস্ত করি, তাহাদের রক্তের লালায় ঐ বিষঘ্ন পদার্থ মিশ্রিত থাকে, কাজেই, এই লালা দ্বারা আমরা যখন টিকা লই, তখন সেই পদার্থ আমাদের রক্তের শ্বেত কণিকাগুলিকে খুব চঞ্চল করিয়া তুলে এবং ইহার ফলে কণিকা হইতে প্রচুর বিষঘ্ন পদার্থ নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। এজন্য এই অবস্থায় বাহির হইতে যদি সেই রোগের জীবাণু দেহকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে আর রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইতে পায় না; দেহপ্রবিষ্ট হইবামাত্র জীবাণুগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে।

মেস্‌নিকফের এই নবতত্ত্বটি বর্ত্তমান যুগের একটি বৃহৎ আবিষ্কার বলিয়া গণ্য হইতেছে। যেদিন মানুষ প্রকৃত বিজ্ঞানবুদ্ধি পাইয়াছিল, সেদিন বুঝিয়াছিল, প্রকৃতি কখনই নিষ্ঠুর নয়; জড়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন না। প্রাণীর চারিদিকে যে ব্যাধির জীবাণু নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ও খাদ্যপানের সহিত যাহা সর্ব্বদা আমাদের শরীরে ও রক্তে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের অনিষ্টকারিতা প্রশমনের উপায় ডাক্তারখানার ঔষধের শিশিতে নাই, একথা বোধহয় বিজ্ঞ চিকিৎসকগণও বুঝিয়াছিলেন। এই কারণেই যে উপায়ে প্রকৃতি তাঁহার সন্তানগণকে সুস্থ রাখেন, তাহা আবিষ্কারের জন্য গত একশত বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ঘোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রভাতে সেই তত্ত্বের আভাস দিয়া মেস্‌নিকফ্ আধুনিক বিজ্ঞানকে ধন্য করিয়াছেন।

— —

মনুষ্যে পশুত্ব

আধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে, আজ আমরা যে সকল প্রাণীকে নানা সুব্যবস্থিত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন দেখিতেছি, তাহাদের সৃষ্টি একদিনে হয় নাই। সেই আমিবা (Amœba) নামক এককোষময় আণুবীক্ষণিক জীবই নানা ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়া দীর্ঘকালে বহুকোষময় হস্তপদযুক্ত বুদ্ধিমান্ প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছে। জলাশয়ের বদ্ধ জল এগুলির জন্মস্থান। আকারে ইহারা একইঞ্চির একশত ভাগের এক ভাগের সমান; কাজেই, ইহাদের জীবনের ক্রিয়া দেখিতে গেলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। উন্নত প্রাণীর যেমন পাক-যন্ত্র, শ্বাস-যন্ত্র, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি আছে, ইহাদের তাহা নাই। নির্জীব লালাময় পদার্থের ন্যায় এগুলি শৈবাল বা অপর জলজ উদ্ভিদের গাত্রে লাগিয়া থাকে। বৃক্ষের শাখায় অঙ্কুর উদ্গত হইলে তাহাই যেমন কালক্রমে বৃহৎ প্রশাখায় পরিণত হয়, ইহাদের দেহ হইতে সেই প্রকার অঙ্কুরাকারে নূতন কোষের সৃষ্টি হয়, এবং তাহাই কালক্রমে মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন আমিবার উৎপত্তি করে। ইহাদের পুংস্ত্রী ভেদ নাই; কাজেই, সাধারণ উন্নত প্রাণী যে প্রকারে বংশ বিস্তার করে, তাহা ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না। আহারের প্রয়োজন হইলে ইহারা জলে ভাসিয়া বেড়ায় এবং কোন খাদ্য দ্রব্য গায়ে ঠেকিলে তাহারই পুষ্টিকর অংশটুকু শোষণ করিয়া দেহ পোষণ করে। এক কথায়,—অঙ্গহীন হইয়াও ইহারা চলাফেরা করে, পাকযন্ত্রহীন হইয়াও পরিপাক-কার্য্য চালায়, এবং জননেন্দ্রিয়বর্জ্জিত হইয়াও সন্তানোৎপাদন করে। এক

অদ্ভুত জীব! কিন্তু এই জীবকেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সমগ্র প্রাণীর পিতামহ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

আমিবা হইতে কি প্রকারে এবং কি ধারায় উন্নত ইতর প্রাণী এবং প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানবের উৎপত্তি হইয়াছে, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, এই আমিবাই নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, এক-কালে মৎস্যাকার জলচর প্রাণীতে পরিণত হইয়াছিল এবং পরে সেই মৎস্যজাতিই উভচর, সরীসৃপ, খেচর প্রভৃতি নানা প্রাণীর মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া শেষে স্তন্যপায়ী প্রাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই উক্তির পোষণার্থে এত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন যে, প্রাণীর অভিব্যক্তির এই সিদ্ধান্তটিতে আর অবিশ্বাস করা যাইতেছে না। এখন সকলেই বলিতেছেন, অতি-প্রাচীনকালে পরিবর্ত্তনের বিচিত্র স্রোতে প্রাণিগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া উন্নতির বিচিত্র পথে ধাবমান হইয়াছিল এবং ইহাদেরই মধ্যে একদল অনুকূল স্রোতের টানে স্তন্যপায়ী প্রাণীতে পরিণত হইয়া শেষে মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভিব্যক্তিবাদের জনক মনীষী ডারুইন সাহেব বানর হইতে যে মানুষের উৎপত্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই।

যাহা হউক, প্রাণীর ক্রমোন্নতির ধারা নির্দ্দেশ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, এবং বিষয়টি এত বিশাল যে, এ প্রকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনাও অসম্ভব। মানুষের দেহ এবং চলাফেরা প্রভৃতি বাহ্য অনুষ্ঠানে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বর্ব্বরতা ও ইতর সংস্কারের যে সকল চিহ্ন আজও দেখা যায় সেগুলি আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়।

মনোরাজ্যে স্মৃতি জিনিষটার আধিপত্য অত্যন্ত প্রবল। নানা বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষ যখন জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়ায়, তখনও গত জীবনের স্মৃতি মুছিয়া যায় না; বাল্যের তুচ্ছ সুখদুঃখ, যৌবনের উদ্যম আশা ও উৎসাহ, প্রৌঢ় জীবনের সাফল্য ও নিরাশা, বৃদ্ধ

তাহার ক্ষীণ দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট দেখিতে পায়। জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত এই স্মৃতির প্রভাব হইতে তাহার মুক্তি নাই। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, মানুষের এই ষাইট্, সত্তর বা শত বৎসরব্যাপী ক্ষুদ্রজীবনে স্মৃতির কার্য্য যেমন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকে, সেই প্রকার লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী যে এক সুদীর্ঘ জীবনের ধারায় পড়িয়া এক-কোষময় জীব আমিবা মানুষে পরিণত হইয়াছে, তাহারও স্মৃতি মানুষের মনে বর্ত্তমান থাকে। এই স্মৃতি সমগ্র মানবজাতির সম্পত্তি। বৃদ্ধ যেমন জীবনের সন্ধ্যাকালে চক্ষু মুদ্রিত করিলেই গত জীবনের সকল ঘটনা স্মরণ করিতে পারে, মানুষ তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনকে সে প্রকার সুপষ্ট দেখিতে পায় না সত্য, কিন্তু সেই স্মৃতি মানুষের তলে তলে কাজ করে। যতই অস্পষ্ট হউক না কেন, ইহার প্রভাব হইতে মানুষের মুক্তি নাই। যাহা হউক, এই ব্যাপারটা খাঁটি মনোবিজ্ঞানের কথা, কাজেই জড়বিজ্ঞানের গণ্ডীর ভিতরে ইহাকে হঠাৎ টানিয়া আনা চলিতেছে না। জলচর, উভচর, খেচর ইত্যাদি নানা পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া যে মানুষের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহার এখনকার উন্নত দেহে পূর্ব্বাকার অভ্যাসের স্মৃতি বর্ত্তমান আছে কি না, ইহা দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ডিম্বে বা মাতৃগর্ভে কি প্রকারে সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি ক্রমিক পরিণতি হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology) নামক এক নূতন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শাস্ত্রটি নূতন হইলেও ইহা দ্বারা ভ্রূণের অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়বিন্যাসের যে ধারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বড়ই অদ্ভুত। নানা ইতর প্রাণীর পর্য্যায় উর্ত্তীর্ণ হইয়া মানুষ যে, এখন উৎকৃষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠপ্রাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ভ্রূণের পরিণতির ধারা পরীক্ষা করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ভ্রূণ একেবারে পূর্ণাবয়ব গ্রহণ করিয়া জন্মায় না; পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহা প্রথমে আমিবার ন্যায় এককোষময় প্রাণীর আকারে অবস্থান করে, এবং পরে সেই কোষটিই খণ্ডিত হইয়া নানা পরিবর্ত্তনের সূচনা করে। কিন্তু এই

পরিবর্ত্তনগুলিকে আঙ্গিক পরিণতির উপায় বলা যায় না, কারণ, ইহার চক্ষু কর্ণ, হস্ত, পদ বা শ্বাসযন্ত্রাদির বিকাশের মোটেই সাহায্য করে না। ইহার ফলে প্রথমেই ভ্রূণে কতকগুলি অনাবশ্যক ও অস্থায়ী ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয় এবং সেগুলি অন্তর্হিত হইয়া গেলে স্থায়ী ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি আরম্ভ হয়।

এই অদ্ভুত ব্যাপারটি এক কালে ভ্রূণতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটে একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কতকগুলি অনাবশ্যক ইন্দ্রিয়ের কোন আকস্মিক আবির্ভাব হয়, এবং শেষে সেগুলি কেনই বা লোপ পাইয়া যায়, ইঁহারা প্রথমে স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে সকল রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভ্রূণতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখিলেন, আদিম প্রাণী যেমন জলচর, উভচর, সরীসৃপ, খেচর প্রভৃতির পর্য্যায় একে একে অতিক্রম করিয়া শেষে স্তন্যপায়ী প্রাণীতে পরিণত হয়, স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণের পরিণতিতেও অবিকল সেই সকল পর্য্যায়ের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। মৎস্যাদি জলচর প্রাণীর ফুসফুস নাই। ইহারা কান্‌কা (Gill) দ্বারা শ্বাসকার্য্য চালায়। কান্‌কায় যে সকল রক্তকোষ সঞ্চিত থাকে, সেগুলিই জলমিশ্রিত বায়ুর অক্সিজেন্ সংগ্রহ করিয়া মৎস্যকে জীবিত রাখে। মানব বা অপর স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণের পরিণতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, উহাতেও প্রথমে সত্যই কান্‌কা জন্মায় এবং কান্‌কার অস্থি-গুলিকে পর্য্যন্ত চিনিয়া লওয়া যায়; এবং তার পর ভ্রূণেই সেগুলি পরিবর্ত্তিত আকার গ্রহণ করিয়া কালক্রমে ফুস্‌ফুসের উৎপত্তি করে।

ব্যাপারটাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। মানুষ এত উন্নত হইয়াও যে, তাহার অতিদূর জ্ঞাতি জলচরদিগের সহিত আজও যোগরক্ষা করিয়া চলিয়াছে, ইহা বাস্তবিক একটা নূতন কথা।

স্তন্যপায়ীর ভ্রূণে ইহাই পূর্ব্বজন্মের একমাত্র লক্ষণ নয়। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন, ভ্রূণের রক্তবহা শিরার বিন্যাস ইত্যাদিতেও

অভিব্যক্তি-সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। জলচর, উভচর প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রাণী ক্রমে ইতর, স্তন্যপায়ী ও শেষে মানুষ হইয়াছে, মানব-ভ্রূণ পরিণতির সময় একে একে অবিকল সেই সকল মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বশেষে মানবাকার প্রাপ্ত হয়।

অস্থিতত্ত্ববিদ্‌গণও নর-কঙ্কালে মনুষ্যজাতির পূর্ব্ব-বৃত্তান্তের আভাস পাইয়াছেন। যে কয়খানি অস্থি দিয়া কঙ্কাল গঠিত, তাহাদের প্রত্যেক খানিরই এক একটা কার্য্য আছে ; কোনটাই দেহে বৃথা স্থান পায় নাই। কিন্তু জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু অনুসন্ধানেও মেরুদণ্ডের শেষ কয়েকখানি অস্থির কার্য্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এগুলি মানবদেহে সংযুক্ত না থাকিলে দেহরক্ষার কোন বিঘ্নই ঘটিত না। এখন সকলে একবাক্যে বলিতেছেন মানবের অতি-প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ যখন নিকৃষ্ট স্তন্যপায়ীর মূর্ত্তিতে বিচরণ করিত, তখন তাহাদের যে লাঙ্গুল ছিল, মেরুদণ্ডসংলগ্ন ঐ কয়েকখানি অস্থি সেই আধুনালুপ্ত লাঙ্গুলেরই পরিচায়ক !

মানুষ এত সুসভ্য হইয়াও, তাহার পূর্ব্ব-জীবনের ইতরতার এই লজ্জাকর চিহ্নটিকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছে না।

মানবদেহের যকৃতের তলদেশটা উপরের মত মসৃণ থাকে না ; দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলি অংশ জোড়া দিয়া যকৃৎ গঠিত। এই অমসৃণতা মানব-ভ্রূণের যকৃতে খুব সুস্পষ্ট থাকে, তা'র পর পরিণতি লাভ করিলে ভ্রূণাবস্থাতেই উঁচুনীচু অংশগুলা ক্রমে সমান হইয়া পড়ে ; কিন্তু অসমতার চিহ্ন একেবারে লোপ পায় না। স্তন্যপায়ী ইতর জন্তু এবং বানরাদির যকৃতে এই লক্ষণটি আরো সুস্পষ্ট থাকে। ইহা দেখিয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন, দেহকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া চারি পায়ে ভর দিয়া চলিবার যে শক্তি পশুতে দেখা যায়, তাহা যকৃতের তলদেশের ঐ অসমতা হইতেই উৎপন্ন। মানুষকে এখন আর চতুষ্পদের ন্যায় চলাফেরা করিতে হয় না, কাজেই তাহার যকৃতের ঐ বিশেষ অংশগুলির

ব্যবহার নাই। অব্যবহারে সকল জিনিষই বিকল হইয়া যায়, এই জন্যই মানব-যকৃৎ এখন পশু-যকৃৎ হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—কিন্তু তথাপি প্রাচীন পশুত্বের নিদর্শন উহা হইতে সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই।

এই ত গেল মানুষের দেহগত পশুত্বের স্থূল নিদর্শন। কিন্তু এগুলি হঠাৎ জনসাধারণের চক্ষে পড়ে না; যাঁহারা শারীরবিদ্যা এবং ভ্রূণতত্ত্ব লইয়া নাড়াচাড়া করেন, কেবল তাঁহারাই এইগুলি দেখিতে পান এবং বুঝিতে পারেন। কিন্তু সভ্যতার ছদ্মবেশের অন্তরালে যে, এই সকল আদিম পশুত্বের নিদর্শন বর্ত্তমান আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যাহা হউক, মানুষের বাহিরের চলাফেরা ব্যাপারে ইতরতার কি পরিচয় পাওয়া যায়, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক।

শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন পুরুষানুক্রমিতার (Heredity) সূত্রে যে কতকগুলি ধর্ম্ম তাহার অস্থিমজ্জায় সংক্রমিত থাকে, সে কেবল তাহা লইয়াই জন্মায়। আমমাংসভোজী অসভ্যের গৃহে বা অতি-সুসভ্য প্রাচীন আর্য্যবংশে জন্ম হইল কিনা, সে দেখে না। যে সম্পদ প্রকৃতি তাহার হাতে দিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, সেইটুকুকেই পাথেয় স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সে জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। সুতরাং, খাঁটি প্রকৃতির দানগুলিকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে হইলে শিশুজীবনের ইতিহাসে অনেক তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ এই উপায়ে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে মানুষ যে, নিকৃষ্ট পশু হইতে অভিব্যক্ত তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

প্রথমেই দেখা যায়, দুই পায়ের উপরে ভর দিয়া চলিবার কৌশলটাকে আয়ত্ত করিতে শিশুকে যত কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, দুই হাত ও জানুর উপর ভর দিয়া চলিবার জন্য তত চেষ্টা করিতে হয় না। একটু সবল হইলেই শিশু "হামাগুড়ি" দিবার কৌশল আপনা হইতেই শিখিয়া ফেলে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে মানবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পশুত্বের

নিদর্শন বলিতে চাহিতেছেন। অসভ্য জাতির মধ্যে এই ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট দেখা যায়; ইহাদের শিশুরা জানু ও করতলে ভর দিয়া চলে না, ঠিক বানরের মতই পদতল ও করতল ভূমিসংলগ্ন রাখিয়া এবং পদযুগলকে প্রসারিত করিয়া "হামাগুড়ি" দেয়।

শিশু যখন প্রথম দাঁড়াইতে শিক্ষা করে, পাঠক যদি তাহার তখনকার অঙ্গভঙ্গি ও চলাফেরা পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে সুস্পষ্ট দেখিবেন, সে দাঁড়াইতে গেলেই হাত দুখানিকে ছড়াইয়া ও অঙ্গুলিগুলিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ এটাকেও মানুষের পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বলিতে চাহেন। আদিম প্রাণী যখন নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বানরপদে উন্নীত হইয়াছিল, তখন বৃক্ষশাখায় বিহার করিবার জন্য তাহাকে জীবনের অধিকাংশ কালই মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কাটাইতে হইত; এই বানরই এক ধাপ উপরে উঠিয়া নর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই, মানব-শিশু এখনও পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই মুষ্টিবদ্ধ থাকা অভ্যাসটা ত্যাগ করিতে পারে নাই।

বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ কোন বস্তু হাতে করিয়া উঠাইতে গেলে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে সেটিকে ধরিয়া উপরে উঠায়। কিন্তু শিশুকে ভূমি হইতে কোন দ্রব্য উঠাইতে বলিলে দেখা যায়, সে হাতের সমস্ত অঙ্গুলি ব্যবহার করিয়া দ্রব্যটি উঠাইতেছে। বানরগণ কখনই হাতের অঙ্গুষ্ঠের ব্যবহার করে না। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে গেলে, তাহারা সকল অঙ্গুলি দ্বারা সেটিকে আঁকড়াইয়া উঠাইয়া লয়। কাজেই, শিশুর এই ভঙ্গিটাকেও বানরত্বের নিদর্শন বলা যাইতে পারে। মানব-সন্তান শৈশব অতিক্রম করিয়া বাল্যে পদার্পণ করিলেও এই সংস্কারটা ছাড়িতে চায় না। বক্‌ম্যান্ (Buckman) নামক জনৈক জীবতত্ত্ববিদ্ এই বিষয়টি লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। ইনি একদিন কতকগুলি বিদ্যালয়ের বালককে একত্র করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে হাত পাতিতে

বলিয়াছিলেন। সকলেই হাত পাতিয়াছিল, কিন্তু শতকরা নব্বই জন অঙ্গুলিগুলিকে করতলের সহিত ঋজুভাবে রাখিতে পারে নাই; ইহাদের অঙ্গুলি ভিতরের দিকে সুস্পষ্ট বাঁকিয়া ছিল। বক্‌মান্ সাহেব এই ব্যাপারটাকেও বানরত্বের লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন। বানরকে খাদ্য দিতে গেলে সে কখনই অঙ্গুলিগুলিকে করতলের সহিত ঋজু রাখিতে পারে না।

— —

বংশের উন্নতিবিধান

জীবতত্ত্বের আধুনিক গ্রন্থাদিতে "Eugenics" নামক একটি নূতন কথা স্থান পাইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে "বংশের উন্নতিবিধান" কথাটাকে উহারি বাঙ্গালা পরিভাষারূপে ব্যবহার করা হইল। "মানববংশের উন্নতিবিধান" বলিলে বোধ হয় পরিভাষাটা আরো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত; কারণ, উদ্ভিদ্ বা মানবেতর প্রাণীর উন্নতিবিধান Eugenics-এর গণ্ডীর ভিতর পড়ে না। আধুনিক সভ্যজাতির সামাজিক বিধিব্যবস্থাগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কি প্রকার করিয়া গড়িলে দুর্ব্বল, অক্ষম ও অল্পবুদ্ধি সন্তানের জন্ম নিবারণ করা যাইতে পারে, তাহা বিজ্ঞানানুগত প্রথায় নির্ণয় করা ইহার প্রধান লক্ষ্য।

বিধিব্যবস্থা দ্বারা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কি প্রকারে বংশের উন্নতি ও বিশুদ্ধি বিধান করিতে হয় আমাদের প্রাচীন পিতামহগণ তাহা খুব বুঝিতেন। ভারতের সমাজপদ্ধতি ও ধর্ম্মতত্ত্বের তলায় তলায় ব্যবস্থাকার ঋষিদিগের সেই অভিপ্রায় অন্তঃসলিলা নদীর স্রোতের ন্যায় আজও প্রবাহিত রহিয়াছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকের বর্ত্তৃতা শুনিয়া হিন্দুসমাজপদ্ধতির পরিবর্ত্তন কল্পনা করা দুর্বুদ্ধির পরিচায়ক হইবে। প্রকৃতির লীলাতে যে মহান্ ঐক্যের আভাস পাইয়াই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অবাক্ হইয়া পড়িয়াছেন, আমাদের ঋষিগণ তাহা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। একই বৃক্ষের পুষ্প, পরাগের আদান-প্রদান করিয়া যে ফল উৎপন্ন করে, তাহা ক্রমেই অবনতি প্রাপ্ত হয়। পরীক্ষাগারে নব্য বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ দেখিয়া এখন প্রচার করিতেছেন, শোণিত-সম্বন্ধযুক্ত একই পরিবারে পুত্রকন্যার বিবাহ দিলে, বংশের অবনতি

অনিবার্য্য। আমাদের ব্যবস্থাকারগণ এই তত্ত্বটিই বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বুঝিয়া বিবাহের যে নিয়ম বিধিবদ্ধ রাখিয়াছেন হিন্দুপাঠকের নিকট তাহার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, সমাজের জটিল তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করা লেখকের অধিকারবহির্ভূত; বংশের উন্নতি অবনতিকে আধুনিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের আলোকে কি প্রকারে দেখিতেছেন এখন তাহারা আলোচনা করা যাউক। একই মাতাপিতার সন্তানগুলির আকৃতি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, জনক-জননীর বিচিত্র সাদৃশ্য লইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করে। কোন সন্তানের হয় ত চুলগুলি ঠিক পিতার অনুরূপ হইল, কিন্তু চক্ষুর গঠন মাতার ন্যায় হইয়া পড়িল। সন্তানের চরিত্র ও মানসিক বৃত্তি-গুলিতেও মাতাপিতার প্রকৃতির এই প্রকার বিচিত্র সম্মিলন দেখা যায়। তা ছাড়া যে পরিবারের সকলেই সুশ্রী বা সদ্‌গুণসম্পন্ন, তাহাতেই কখন কখন কুশ্রী বা দুর্বৃত্ত কুলাঙ্গারের জন্মও দুর্লভ নয়। জন্মব্যাপার এই সকল বৈচিত্র্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। পুরুষানুক্রমিতা (Heredity) মানুষকে কি প্রকারে গঠন করে, এবং তা'র পর শিক্ষা ও ইচ্ছাশক্তি তাহার উপর কি প্রকার কার্য্য করে, এগুলির মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করা ইঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। বলা বাহুল্য, প্রাচীন পণ্ডিতদিগের দ্বারা এই গভীর প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ আবার নূতন করিয়া ইহারি গবেষণায় লাগিয়াছেন।

আধুনিক জীববিজ্ঞানে "Genetics" অর্থাৎ জন্মতত্ত্ব নামক এক শাখা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের নিকট ইহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজন। মাতা-পিতার কোন্ কোন্ প্রকৃতি লইয়া জীবগণ সাধারণতঃ জন্মগ্রহণ করে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া একটা ব্যাপক নিয়ম দাঁড় করানো এই

বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, শারীরবিদ্যাই (Physiology) এই শাস্ত্রের প্রধান ভিত্তি। যাঁহারা ইহাকে অবলম্বন করিয়া আছেন, তাঁহারা দেশ-বিদেশে প্রাণি-উদ্ভিদের জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধানে যথেষ্ট শ্রম করিতেছেন, এবং কোন্ জীবে মাতাপিতার কোন্ কোন্ প্রকৃতি কি প্রকারে সংক্রমিত হইল তাহা তালিকাবদ্ধ করিতেছেন। বংশের উন্নতিবিধান যাঁহাদের লক্ষ্য (Eugenists) তাঁহারা কেবল পুরুষ-পরম্পরাগত গুণগুলিকে রাখিয়া দোষগুলির উচ্ছেদ সাধনে ব্যস্ত। জন্মতত্ত্বনির্ণয় যাঁহাদের উদ্দেশ্য (Genetics), তাঁহারা ঐ প্রকার বিশেষ লক্ষ্যের সন্ধানে চলেন না; জন্মতত্ত্বে যাহা কিছু সত্য ও চিরন্তন বস্তু আছে, তাহারি সন্ধান করিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করাই ইঁহাদের কাজ। ভালমন্দের দিকে ইঁহারা দৃক্‌পাত করেন না। যাঁহারা বংশের উন্নতিবিধানের জন্য বদ্ধপরিকর, তাঁহারা এই জন্মতত্ত্ব-বিদ্‌দিগের নবাবিষ্কৃত সত্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন।

যে বিকৃতবুদ্ধি আজন্মব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুক রাজপথে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, সে যদি কোন প্রকারে একটি পাত্রী সংগ্রহ করিয়া বিবাহের জন্য উপস্থিত হয়, তবে কোন পাদ্রী, মৌলবী বা পুরোহিত এই পরিণয়ে বাধা দিতে পারেন না। বরং অনুষ্ঠানের শেষে এই প্রকার বরকন্যার মিলনে তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে আশীর্ব্বাদ করিতে হয়। উন্নতিপন্থীর দল প্রথমেই এই প্রকার বিবাহে ঘোর আপত্তি করিতেছেন। শূন্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহার পতন যেমন অবশ্যম্ভাবী, যাহাদের শরীর ও মন আজন্ম দুর্ব্বল তাহাদের সন্তানগণেরও দুর্ব্বল শরীর ও মন লইয়া জন্মগ্রহণ ঠিক সেই প্রকার অবশ্যম্ভাবী। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, উন্মাদ প্রভৃতি বহু ব্যাধি মানুষকে একবার স্পর্শ করিলে জীবনান্তের সহিতও সেগুলি লোপ পায় না।

পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাহাদের ধারা পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে চলিতে থাকে। সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক নানা দেশের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়া সে-গুলির সহিত তাহাদের মাতাপিতা প্রভৃতির কোন ঐক্য আছে কি না, অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইহাতে যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা অদ্ভুত। কেবল ব্যাধিই সন্তানে সংক্রমিত হয় না; চক্ষুর বর্ণ, কেশ, মস্তকের গঠন, কার্য্যতৎপরতা, নিষ্ঠা, সূক্ষ্মদর্শন প্রভৃতি দেহ ও মনের অনেক লক্ষণই মাতাপিতার অনুরূপ হইতে দেখা যায়। উন্নতিপন্থীরা এই সকল পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, যাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত বা দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক বিবাহ করিয়া সমাজের ঘাড়ে সেই প্রকার সহস্র সহস্র দুর্ব্বল সন্তানের গুরুভার না চাপায়, তাহার প্রতি সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

যাহাদের নীতিজ্ঞান এবং বুদ্ধি আজন্ম অল্প, য়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় সহরে রাজব্যয়ে বা জনসাধারণের অর্থে তাহাদিগকে পোষণ করা হইয়া থাকে। উন্নতিপন্থীরা এই হিতকার্য্যেরও ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইঁহারা বিজ্ঞানের সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, যখন মানুষের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য পৈতৃক দান, তখন আশ্রম-বিশেষে আবদ্ধ রাখিয়া শিক্ষা দিলে মানুষের প্রকৃতি কখনই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। পলিতকেশ বৃদ্ধ কেশে কলপ লাগাইয়া বাহিরের লোকের নিকট কিছুদিন যুবক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহার বৃদ্ধত্ব ঘোচে না। যাহারা আজন্ম অক্ষম, অভ্যাস ও শিক্ষার জোরে তাহারা সেই প্রকার কিছুদিন মাত্র সমাজের চক্ষে ধূলি দিতে পারে। কিন্তু ইহারাই যখন সন্তানের জনক-জননী হইয়া দাঁড়ায়, তখন সেই ফাঁকি ধরা পড়িয়া যায়। পৈতৃক শোণিতের দোষে যাহারা অক্ষম ও অল্পবুদ্ধি, তাহাদের

সন্তানগণ জনক-জননীর কৃত্রিম শিক্ষা বা সংস্কারের ভাগ লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় না, সহস্র কৃত্রিমতার আবরণ ছিন্ন করিয়া মাতাপিতার প্রকৃতিগত অক্ষমতাটুকু লইয়াই জন্মগ্রহণ করে।

এই যুক্তি দেখাইয়া উন্নতিপন্থীরা বলিতেছেন, হিতানুষ্ঠান-বোধে যাঁহারা অক্ষমদিগকে সভ্য-ভব্য করিয়া আশ্রম হইতে বাহির করিতেছেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে সমাজের অকল্যাণই করিতেছেন। যখন অক্ষমপোষণের ব্যবস্থা ছিল না, স্বাভাবিক দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য লোকগুলা যোগ্য-ব্যক্তিদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাভূত হইয়া লোপ পাইয়া যাইত, তখন কৃত্রিম শিক্ষার জোরে গৃহস্থ হইয়া তাহারা বহু দুর্ব্বল পুত্রকন্যার জনকজননী হইবার সুযোগ পাইত না। শস্যক্ষেত্রের দুর্ব্বল গাছগুলি যেমন পার্শ্বের সুস্থ গাছের চাপে আপনি মরিয়া যায়, স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই সেই প্রকারে অযোগ্যদিগকে যোগ্যতরের নিকট হার মানাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করিতেন।

ভাল মন্দ লইয়াই সংসার। সৎপ্রবৃত্তির বীজ যেমন মানুষের দেহে আছে, অসৎপ্রবৃত্তির বীজও সেই প্রকার কোন কোন মানুষে সুপ্তাবস্থায় রহিয়াছে। কাজেই, বংশপরম্পরায় উভয়ই সন্তানে সংক্রামিত হইয়া সৎ এবং অসৎ এই দুই শ্রেণীর লোকের উৎপত্তি করিবেই। এখন সমাজের এই অসৎ, দুর্ব্বল এবং স্বাভাবিক অল্পবুদ্ধি সম্প্রদায়কে লইয়া কি করা কর্ত্তব্য, তাহা একটা মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতর প্রাণিগণ এককালে বহু সন্তান উৎপন্ন করে। ইহাদের সন্তানবাৎসল্য খুব প্রবল নয়; সদ্যোজাত সন্তানগুলিকে প্রকৃতির কোলে দিয়া ইহারা বেশ নিশ্চিন্ত থাকে। প্রকৃতি কখনই স্বাভাবিক দুর্ব্বল ও অক্ষমকে প্রশ্রয় দেন না। ইহারা কঠোর জীবন-সংগ্রামে যোগ দিবামাত্র, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভব মানিয়া মরিয়া যায়। যাহারা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মপটু কেবল তাহারাই টিকিয়া থাকে।

প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানুষ যদি ইতর প্রাণীর ন্যায় এই প্রকারে দুর্ব্বল সন্তান-গুলিকে নিঃসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহা কখনই মনুষ্যোচিত কার্য্য হয় না।

উন্নতিপন্থীরা এই সমস্যার মীমাংসার জন্য এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেছেন। ইঁহারা বলিতেছেন, অক্ষম ও দুর্ব্বলবুদ্ধি লোকদিগকে, কৃত্রিম শিক্ষা দিয়া সমাজে না ছাড়িয়া, তাহাদের কৌমার্য্য রক্ষা করিয়া বিশেষ আশ্রমে আবদ্ধ রাখা হউক। এই চিরকুমারগুলিকে উপভোগের সামগ্রী হইতে বঞ্চিত করার আবশ্যক নাই। আশ্রমের চারিদিকে সুবিস্তৃত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ ও বৃহৎ উদ্যান থাকুক এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা রাখা হউক। ইহাতে স্বল্পবুদ্ধি অক্ষম নরনারীগুলি সমাজের স্কন্ধে বহু আজন্মনির্ব্বোধ অপত্যের ভার না চাপাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া যাইতে পারিবে। উন্নতিপন্থীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, অন্তত দুইপুরুষকাল যদি অল্পবুদ্ধি লোকগুলাকে এই প্রকারে আটকাইয়া রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে সমাজ হইতে এই শ্রেণীর আবর্জ্জনাগুলি নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

ইঁহাদের এই সকল আলোচনা আধুনিক সভ্যসমাজের রাজাপ্রজা উভয়েরই মন আকর্ষণ করিয়াছে। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আমেরিকার গত চল্লিশ বৎসরের জন-গণনার তালিকা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখাইতেছেন, একদিকে অগাধ ধনসম্পদ্ যেমন দেশের কতক লোককে বিলাস-ব্যাধিতে পঙ্গু করিয়া তুলিতেছে, অপরদিকে সেইপ্রকার স্বাভাবিক অক্ষমের দল সাধারণের অন্নে পুষ্ট হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় বংশবৃদ্ধি করিতেছে। এই দুই সম্প্রদায়কে প্রশ্রয় দিতে থাকিলে, অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে কর্ম্মী পুরুষ দেশে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িবে। যাহা হউক উন্নতিপন্থীদিগের এই প্রকার উক্তি য়ুরোপ ও আমেরিকার

এক দল লোককে খুব বিচলিত করিয়াছে। আমেরিকার কয়েকটি প্রাদেশিক বড় সহরে ইতিমধ্যেই কয়েকটি অক্ষমনিবাসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অক্ষম ও দুর্ব্বলের ক্রমিক উচ্ছেদসাধনের জন্য কেবল পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াই উন্নতিপন্থীরা ক্ষান্ত হইতেছেন না। বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন নরনারীর মিলনে কি প্রকারে ইচ্ছানুরূপ গুণবিশিষ্ট সন্তান পাওয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে ও পরীক্ষা চলিতেছে। পরীক্ষা অবশ্য এখন উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীর উপর করা হইতেছে। শুনা যাইতেছে, ইহাতে পুরুষাক্রমিতা (Heredity) সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, তাহা খুবই অদ্ভুত।

প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ মেণ্ডেলের (Mendel) নাম হয়ত পাঠক শুনিয়া থাকিবেন। লোকটি একজন নগণ্য ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁহার ভজনালয়ের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে যে একটি ছোট উদ্যান ছিল, তাহাতে তিনি নানা জাতীয় মটর কড়ায়ের গাছ পালন করিতেন এবং গাছগুলি পুষ্পিত হইলে, একের পরাগ অপরের গর্ভকেশরে লাগাইয়া কি প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় পরীক্ষা করিতেন। দীর্ঘকাল এই প্রকার পরীক্ষায় কেবল পরাগের আদান-প্রদান সাহায্যে ইনি ছোট মটরকে বড় করিবার বা সবুজ মটরকে সাদা করিবার কতকগুলি মূল সূত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তা'রপর সেই সূত্র-অনুসারে বিবিধগুণসম্পন্ন গোমেষাদি পশু এবং বিবিধ বর্ণের কুক্কুট ও হংস প্রভৃতি পক্ষীর শাবক উৎপন্ন করিয়া উদ্ভিদের নিয়ম প্রাণীতেও খাটিতে দেখিয়াছিলেন। মেণ্ডেল সাহেব আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় পাণ্ডিত্যাভিমানী ছিলেন না, নীরবে কাজ করিয়া আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার আবিষ্কারের কোন বিবরণই সংবাদপত্রে বা বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে প্রচারিত হয় নাই, নিজের হস্তলিখিত কয়েক

খানি পুঁথির পাতায় সেগুলি দীর্ঘ পনের বৎসর অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ কোন গতিকে পুঁথির সন্ধান পাইয়া, এখন তাহাতে বর্ণিত সকল ব্যাপারকেই অদ্ভুত দেখিতেছেন।

Genetics অর্থাৎ জন্মতত্ত্ব নামক যে নূতন শাস্ত্রের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির উপরেই তাহা প্রতিষ্ঠিত। এই প্রথায় চলিয়া Genetics-এর দল গোজাতি এবং শস্যপ্রদ বহু উদ্ভিদের অশেষ উন্নতিবিধান করিতেছেন। মনে করা যাউক, যেন ভারতবর্ষের গাভী অধিক দুগ্ধ দান করে, কিন্তু ইহারা অল্পজীবি এবং রুগ্ন। অষ্ট্রেলিয়ার গাভী খুব সুস্থ কিন্তু অল্প দুধ দেয়। বলা বাহুল্য, এই দুই গো-বংশের সদ্‌গুণগুলিকে লইয়া যদি কোন নূতন গো-বংশের উৎপত্তি করা যায়, তবে সংসারে এক আদর্শ গো-বংশের সৃষ্টি করা হয়। Genetics-এর দল এখন এই প্রকার সৃষ্টিকার্য্যে মন দিয়াছেন এবং আংশিক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। মানব-বংশের উন্নতিবিধান যাঁহাদের জীবনব্রত হইয়াছে, তাঁহারা এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতেছেন। মেণ্ডেলের নিয়মানুসারে সভ্য মানুষকে স্বাস্থ্যে, সৌভাগ্যে এবং বুদ্ধিতে আদর্শ মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলাই ইঁহাদের চরম লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মার্কিণ জাতির যতই সদ্‌গুণ থাকুক না কেন, হুজুকপ্রিয় বলিয়া তাহার একটা ঘোর অখ্যাতি আছে। মানব-বংশের উন্নতিবিধান যাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই আমেরিকাবাসী। স্বভাবতঃ অক্ষম এবং দুর্ব্বলবুদ্ধি নরনারীদিগকে অবরুদ্ধ রাখার প্রস্তাবটা ইঁহাদেরি কল্পনাপ্রসূত। খোঁয়াড়ে আবদ্ধ রাখিয়া ইতর প্রাণীগুলির বংশোন্নতিবিধান সম্ভব বলিয়া, মানুষেও তাহা সম্ভব, এই কথাটা মনে করিয়া তাঁহারা বোধহয় খুব একটা ভুল করিতেছেন। মানুষ কখনই একেবারে পশু নয়। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিবেক-

বুদ্ধি, ভালবাসা প্রভৃতি যে সকল বিশেষ গুণ প্রকৃতিদেবী মানুষকে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা কি মানুষের কর্ত্তব্য নয়? এই সকল গুণ মানুষকে আশ্রয় করিয়া তাহার পশু-প্রবৃত্তিগুলিকে যে কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাও আমাদের জানা নাই। পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া দাম্পত্য প্রেম নামক আর একটি পরম দান যখন প্রকৃতিদেবী মানুষকে দিয়াছেন, এবং নারীর হৃদয়কে কোমল ও স্নেহপ্রবণ করিয়া গিয়াছেন, তখন সেইগুলির ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করিয়া নরনারীকে পশুবৎ পালন করিতে থাকিলে, একটা অনৈসর্গিক ব্যাপারকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না কি? প্রকৃতি যাহাকে নিজের হাতে মূর্ত্তিমান্ করেন, বৈজ্ঞানিক শিল্পির যন্ত্রের স্পর্শে তাহা কুশ্রী ও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। বাঁধ দিয়া নদীর স্রোত রোধ করিতে গেলে, তাহাকে যে কেবল কুশ্রী করা হয় তাহা নয়, সেই মাতৃরূপিণীর বিমল স্তন্যধারা বিষে পরিণত হয় এবং কুলপ্লাবিনী বন্যা আসিয়া মৃত্যুর বিভীষিকা দেখায়। প্রকৃতির অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে গেলেই পদে পদে অকল্যাণ দেখা দিবে। আমেরিকার কলকারখানা ও কৃত্রিমতাপূর্ণ জীবনের কথা শুনিয়া সেদিন একজন ঋষিকল্প প্রবীণ সাহিত্যিক তাহাকে দানবীয় সভ্যতা নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। বংশের উন্নতিবিধানের জন্য মার্কিণদিগের এই চেষ্টাকেও সত্যই দানবীয় সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া মনে হইতেছে।

চক্ষু ও আলোক

আলোক বাহির হইতে আসিয়া অক্ষি-যবনিকার উপর পড়িলে, তাহার দৃষ্টি-নাড়ীকে নানাপ্রকারে উত্তেজিত করে, এবং ইহার ফলে বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আলোকের শক্তি কি প্রকারে দৃষ্টি-নাড়ীকে (Optic Nerve) উত্তেজিত করে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

অক্ষি-যবনিকার (Retina) গঠন পরীক্ষা করিলে, ইহাতে কতকগুলি কোষ পর পর সজ্জিত দৃষ্ট হয়। ঐ স্তরমালার সর্ব্বোপরি মোচার আকারে কতকগুলি কোষ বিন্যস্ত থাকে। কাজেই ইহাদেরই উপরে সর্ব্বাগ্রে আলোকপাত হয় এবং আলোকের কাজও ইহাদেরই উপর দিয়া সুরু হয়।

বাহিরের শক্তি প্রাণীকোষের উপর কার্য্য করিয়া কি ফল উৎপন্ন করে, আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং আলোক প্রাপ্ত হইলে দেহের অপর কোষগুলি যে প্রকারে কার্য্য করে, অক্ষিকোষগুলিও যে সেই প্রকারে কার্য্য করিবে এরূপ সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক। বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক্ এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

দেহের নানা অংশের কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, কোষস্থিত জীব-সামগ্রী (Protopaslm) উত্তেজনা পাইলে আপনা হইতে এক এক প্রকার রস নির্গত করিতে থাকে। এই রসগুলি ইংরাজীতে Ferments নামে পরিচিত। সংস্কৃতে এগুলিকে কিণ্ব বলা যাইতে পারে। এই রস নির্গমন জীবসামগ্রীর (Protoplasm) সজীবতার একটা প্রধান লক্ষণ। কিণ্বসকল জীবদেহে সঞ্চিত হইলে, কখনই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া থাকে না। ইহাদের প্রত্যেকেই দেহের ভিতরে এক একটা রাসায়নিক

কার্য্য সুরু করিয়া দেয়, এবং ইহার ফলে অবস্থাবিশেষে দেহের ক্ষয় বা গঠনকার্য্য চলিতে আরম্ভ করে। আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবসামগ্রী হইতে সঞ্চিত নানা প্রকার কিণ্বের এই ক্ষয় ও সংগঠনকার্য্য (Katabolie and Anabolie) অবলম্বন করিয়াই দেহতত্ত্বের অনেক সমস্যার মীমাংসা করিতেছেন।

উদাহরণ লওয়া যাউক। পাকাশয়স্থ কোষের (Gastric Cells) কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। এগুলি হইতে পেপ্সিন্ (Pepesin) নামক এক প্রকার রস উত্তেজনা পাইলেই নির্গত হয়। উদরস্থ খাদ্যের প্রটিড্ (Proteid) নামক অংশের সহিত মিশিয়া ইহা রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয়, এবং ইহার ফলে প্রটিড্ পিপ্‌টোনে (Peptone) পরিণত হইয়া পড়ে। প্রটিড্ জিনিষটা উদ্ভিজ্জ খাদ্যমাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে থাকে। রক্ত এবং পেশীর ইহা একটি প্রধান উপাদান। পাকাশয়ের নিকটে ক্লোম (Prancreas) নামক একটি অংশ আছে। ইহারও কোষগুলি হইতে একপ্রকার রসনির্গমন দেখা গিয়াছে। ইহা উদরস্থ দ্রব্যের শ্বেতসারের সহিত মিশিয়া, তাহাকে চিনিতে পরিণত করে এবং এই সকল কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক ও স্নায়বিক শক্তিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, প্রাণিদেহের অপর অংশের কোষগুলি যেমন নানাজাতীয় কিণ্ব নির্গত করিয়া জীবনের কার্য্য করিতে থাকে, সম্ভবতঃ অক্ষি-যবনিকার কোষগুলির উপরে আলোক পড়িলে, সেই প্রকার কোন কিণ্ব আপনা হইতেই নির্গত হয়; এবং ইহাই অবস্থাবিশেষে ক্ষয় বা সংগঠন কার্য্য সুরু করিয়া দৃষ্টি-নাড়ীকে উত্তেজিত করে।

অক্ষি-যবনিকার কোষগুলির উপর আলোক পড়িলে যে সত্যই ঐ প্রকার কার্য্য হয়, সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ ওয়ালার (Waller) সাহেব

তাহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় প্রমাণ করিয়াছেন। ইনি ভেকের চক্ষু কাটিয়া লইয়া একটি তারের দুই প্রান্ত চক্ষুর সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তড়িৎমাপক যন্ত্র (Glavanometer) দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল, অতি-মৃদু তড়িৎ-প্রবাহ চক্ষুর পুরোভাগ হইতে পশ্চাৎদিকে চলিতেছে। ইহাই চক্ষুর স্বাভাবিক প্রবাহ। তা'র পর হঠাৎ চক্ষুর উপর আলোকপাত করায় সেই প্রবাহকেই প্রবলতর হইতে দেখা গিয়াছিল। ইহা হইতে পরীক্ষক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, আলোকের উত্তেজনা প্রাপ্ত হইলে চক্ষে সংগঠন কার্য্য আরম্ভ হয়। পুনঃপুনঃ নানাপ্রকার আঘাত-উত্তেজনার প্রয়োগে চক্ষুকে অবসন্ন করিয়া আলোকপাত করিলে প্রবাহ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে আসিতে আরম্ভ করে। ডাক্তার ওয়ালার ইহাকে আলোকের ক্ষয়কার্য্যের (Katabolic Changes) অব্যর্থ লক্ষণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

ডাক্তার অলচিন (Allchin) একজন প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ। আলোকের শক্তি অক্ষি-যবনিকার উপর পড়িলে, যে রস নির্গত হয়, তাহাকে ইনিও দৃষ্টি-নাড়ীর উত্তেজনার মূল কারণ বলিয়াছিলেন। ইঁহার মতে কেবল এই রসই ক্ষয় বা সংগঠনকার্য্য করিয়া রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন করে, এবং সেই শক্তিই রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া চক্ষুর পেশীর আকুঞ্চন-প্রসারণ ও স্নায়ুমণ্ডলীর নড়-চড় প্রভৃতি নানা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেয়।

পাকাশয়ের পাকরস ও ক্লোম রসের (Amylopsin) পরিচয় আমরা জানি। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সকল রস প্রাণিদেহ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের গুণাগুণ নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আলোক পাইলেই অক্ষি-যবনিকার কোষসকল যে রস নির্গত করে, তাহা আজও সংগ্রহ করা হয় নাই। হেরিং সাহেব বর্ণজ্ঞান উৎপত্তির ব্যাখ্যান দিবার সময়, অক্ষি-কোষের মধ্যস্থ রসবিশেষে (Visual

Purple) কতকগুলি ধর্ম্মের আরোপ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে যে কিণ্বের (Ferment) উল্লেখ করিয়াছি, সম্ভবতঃ তাহা এবং হেরিং সাহেব কল্পিত অক্ষি-কোষের রস, মূলে একই জিনিষ।

আলোক ও দৃষ্টিজ্ঞানসম্বন্ধে প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলি লইয়া যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এখন আলোক জিনিষটা কি, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পাঠক অবশ্যকই অবগত আছেন, ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্তি ঈথর নামক পদার্থের ক্ষুদ্র তরঙ্গমালাই আলোকের উৎপাদক। এই তরঙ্গগুলির মধ্যে কোনটিই নিজে আলোক নয়। ইহা যখন চক্ষে আসিয়া অক্ষি-যবনিকার কোষগুলির উপর ধাক্কা দেয়, তখন কেবল আমাদেরই নিকট সেই ধাক্কা আলোক-আকারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। লঙ্কা মরিচ নিজে কটু নয়, জিহ্বাগ্র স্পর্শ করিয়া কটুতার পরিচয় দেয়। ঈথর-তরঙ্গও সেই প্রকার নিজে আলোক নয়। অক্ষি-যবনিকায় আসিয়া ধাক্কা দিয়া, কেবল আমাদেরই চক্ষুতে আলোক প্রকাশ করে।

জল আলোড়িত হইলে, তাহাতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা আকারের তরঙ্গ-মালা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া পড়ে। ঈথরের কোন অংশ নাড়া পাইলে তাহাতে ঐ প্রকারের নানা আকারের ছোট-বড় তরঙ্গ-চলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমাদের চক্ষু এই বিচিত্র তরঙ্গমালার সকলগুলিতে সাড়া দেয় না। বৃহৎ এবং অতি-ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি চক্ষুকে মোটেই সচেতন করিতে পারে না। কোন পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে বৃহৎ তরঙ্গগুলি তাপের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। তখন ইহারা দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য না হইয়া কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া পড়ে। অতি-ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলির কার্য্য আরো সৃষ্টিছাড়া। দর্শনেন্দ্রিয় বা স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর ইহাদের কোনই প্রভাব নাই। কতকগুলি পদার্থের

উপর আসিয়া পড়িলে, সেখানে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত করিয়া নিজেদের অস্তিত্বের পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। ফোটোগ্রাফের কাচ সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত রাখিলে, ঐ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিই কাঁচের প্রলেপকে কালো করিয়া দেয়।

একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করা যাউক, অন্ধকার ঘরে দীপশিখায় যেন একখণ্ড তারকে গরম করা হইতেছে। উত্তাপ পাইলেই পদার্থ মাত্রেরই অণু ঘন ঘন কম্পিত হইতে আরম্ভ করে। এই কম্পন অবশ্যই আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না; কিন্তু তাপ পাইলেই যে পদার্থের অণুসকলের কম্পন আরম্ভ হয়, তাহার শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাপের বৃদ্ধির সহিত যখন তারের অণুগুলির অতি দ্রুত কম্পন সুরু হয়, তখন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ঈথর চঞ্চল অণুর ধাক্কায় কম্পিত হইয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা আকারের তরঙ্গ রচনা করিতে থাকে। স্থির জলের কোন অংশকে আলোড়িত করিলে, আলোড়ন-স্থানকে কেন্দ্র করিয়া যেমন ছোট-বড় নানা তরঙ্গ জলাশয়ের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এখানেও তারটিকে কেন্দ্র করিয়া নানা ঈথর-তরঙ্গ চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করে। তাপের পরিমাণ যখন অল্প থাকে, তখন তারের আণবিক কম্পন খুব দ্রুত চলে না। কাজেই, এই সকল কম্পনের ধাক্কায় যে ঈথর-তরঙ্গ উৎপত্তি হয়, তাহার আকার খুব বড় হইয়া পড়ে। এই বৃহৎ তরঙ্গগুলিই তাপতরঙ্গ। চক্ষু ইহাদের আঘাতে সাড়া দেয় না। কোন পদার্থ এই তরঙ্গগুলির ধাক্কা পাইলে গরম হইয়া উঠে মাত্র। তারগাছটিকে সদ্য সদ্য দীপশিখা হইতে উঠাইয়া গাত্রসংলগ্ন করিতে গেলে আমরা যে তাপ অনুভব করি, তাহা ঐ বড় বড় ঈথর-তরঙ্গগুলিরই ধাক্কার সংস্পর্শের ফল।

এখন মনে করা যাউক, তারগাছটিকে যেন বহুক্ষণ দীপশিখায় রাখিয়া অত্যন্ত গরম করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় ইহার

অণুগুলির আর পূর্ব্বের ন্যায় ধীর কম্পন থাকিবে না। অতি দ্রুত-বেগে ঘন ঘন কম্পিত হইয়া সেগুলি পার্শ্বস্থ ঈথরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা উৎপন্ন করিতে থাকিবে। এই ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিই আলোকোৎপাদক তরঙ্গ। ইহারাই চক্ষে আসিয়া ধাক্কা দিলে আলোকের উৎপত্তি হয়।

ইহার পরও তারগাছটিকে গরম করিতে থাকিলে তাহাতে যে সকল অতি-ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সে-গুলিতে মোটেই আলোক-উৎপাদন শক্তি দেখা যায় না, এবং অতি-বৃহৎ তরঙ্গগুলির ন্যায় তাহাদের তাপোৎপাদন শক্তি থাকে না। এই সকল তরঙ্গের সংস্পর্শে আসিলে কতকগুলি জিনিষে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়, কেবল তাহা দ্বারাই ইহাদের অস্তিত্ব জানা যায়।

এই প্রবন্ধে চক্ষুর উপরে ঈথর-তরঙ্গের যে সকল অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যের কথা আলোচিত হইল, তাহা মনে করিলে চক্ষুকে একটি সুগঠিত যন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। যান্ত্রশিল্পের উন্নতির সহিত আজকাল অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের কোনটিকেই চক্ষুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না। বিধাতার নির্দ্দেশে স্বয়ং প্রকৃতিদেবী যে যন্ত্রকে ধীরে ধীরে সর্ব্বাংশে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা যে চিরদিনই শত শত মানব-"বিশ্বকর্ম্মার" শিল্প-চাতুর্য্যকে পরাভব করিতে থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। একজন খ্যাতনামা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তাঁহার একখানি গ্রন্থে লিখিয়াছেন,... আমাদের চক্ষু যে খুব সুব্যবস্থিত যন্ত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও সুব্যবস্থিত যন্ত্র, আজকাল অনেক শিল্পী নিজের হাতে প্রস্তুত করিতেছেন। কথা কয়েকটি যে কত অসার এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী বৈজ্ঞানিকপ্রবরের মুখে সেগুলি যে কত অশোভন হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করুন। পণ্ডিতপ্রবর নিশ্চয়ই জানেন, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বিশ্বের সৌন্দর্য্য কোন ক্রমে বিশ্বের নিজস্ব নয়।

তরুলতার নয়ন-স্নিগ্ধকর শ্যামলতা, উষার অরুণিমা এবং মেঘের বিচিত্র বর্ণলীলা, তরুলতা, উষা বা মেঘ কাহারও বিশেষ ধর্ম্ম নয়। ঈথর বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ প্রতিফলন করিয়াই তাহার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলে। তারপর এক চক্ষুই সেই তরঙ্গগুলিকে আশ্চর্য্যজনক বিচিত্র-বর্ণে পরিণত করে। এই সকল ব্যাপার জানিয়াও যাঁহারা চক্ষুর ন্যায় এক সুব্যবস্থিত অদ্ভুত যন্ত্রকে সাধারণ যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া তাহার অপকৃষ্টতা দেখাইবার জন্য চেষ্টা করেন তাঁহাদের ধৃষ্টতা সত্যই অমার্জ্জনীয়।

ঈথরের অন্ধ কম্পন, যে যন্ত্রের সুব্যবস্থায় বিচিত্রবর্ণের আলোকে পরিণত হইয়া সর্ব্বদা মানবমাত্রেরই আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে, তাহাকে বিশ্বনাথের একটি শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ বলিয়া সকলকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেই হইবে।

সূক্ষ্ম নল পতঙ্গমাত্রেরই দেহের সর্ব্বাংশে জটিলভাবে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। এই নলিকাগুলিই উহাদের শ্বাসযন্ত্র। এগুলি যখন বায়ুপূর্ণ হইয়া পড়ে, তখন দেহের প্রায় সর্ব্বাংশ বায়ুস্থ অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে।

ফাঁপা হইলে জিনিষ প্রায়ই ভঙ্গপ্রবণ হয়। ফাঁপা নল একটু চাপ পাইলেই ভাঙ্গিয়া যায়। এই জন্য এসকল জিনিষকে অতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়। বাগানের গাছে জল দিবার জন্য যে সকল দীর্ঘ রবারের নলে ব্যবহৃত হয়, বাহিরের আঘাতে সে-গুলি যাহাতে হঠাৎ নষ্ট হইয়া না যায়, তাহার জন্য মোটা তার স্প্রিংএর মত করিয়া তাহাদের চারিদিকে জড়াইয়া রাখা হয়। ধাক্কা লাগিলে এই তারই তাহা সাম্‌লাইয়া লয়। পতঙ্গের শ্বাসযন্ত্রে যে সকল নলিকা থাকে, সেগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ঠিক্‌ এইপ্রকার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তারেরই মত এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম সূত্র নলিকার ভিতর স্প্রিংএর মত জড়ানো থাকে। কাজেই, বাহিরের চাপে সহসা নলের কোন ক্ষতি হয় না।

মানুষ এবং অপর উচ্চশ্রেণীর জীবগণ নাসিকার ছিদ্রপথ দিয়া বায়ু টানিয়া লয়। কান্‌কাযুক্ত জলচর প্রাণিগণ বাহিরের জল কান্‌কার ভিতর দিয়া চালাইয়া তাহাকেই আবার মুখ দিয়া বাহির করে। পতঙ্গজাতীয় প্রাণীর শ্বাসযন্ত্রের সহিত নাসিকা বা মুখ-বিবরের অণুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ইহাদের দেহের পার্শ্বে কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র (Spiracles) থাকে। এইগুলি পতঙ্গের দেহস্থ নলিকাগুলির মুখ। বাহিরের বায়ু অনায়াসে এই সকল ছিদ্রপথ দিয়া নলে প্রবেশ করিতে পারে। বায়ুমিশ্রিত ধূলিকণা প্রভৃতি কঠিন পদার্থ যাহাতে হঠাৎ দেহে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্যও প্রবেশপথে সুব্যবস্থা আছে। কতকগুলি পতঙ্গদেহের ঐ ছিদ্রপথগুলি এমন

সুবিন্যস্ত লোমে আবৃত থাকে যে, কেবল বায়বীয় পদার্থ ব্যতীত অপর কোন পদার্থই নলে প্রবেশ করিতে পারে না ; অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণাও ঐ সকল সুসজ্জিত লোমে আট্‌কাইয়া যায়।

বৃশ্চিক এবং কেন্দ্রী (কেন্নো) প্রভৃতি শতপদী প্রাণিগণ পতঙ্গ-জাতিভুক্ত নয় ; কিন্তু তথাপি ইহাদের শ্বাসযন্ত্রে পতঙ্গের শ্বাসযন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত ক্ষুদ্র নলিকা ইহাদের দেহাভ্যন্তরে গুচ্ছাকারে পরিব্যাপ্ত থাকে। পার্শ্বস্থ ছিদ্রগুলির সাহায্যে নলে বায়ু প্রবেশ করিলে রক্ত অক্সিজেন-যুক্ত হইতে আরম্ভ করে।

মক্ষিকা জাতীয় কতকগুলি প্রাণী জীবনের প্রথমাংশে যখন শুঁয়ো-পোকার আকারে (Larval Condition) থাকে, তখন তাহাদিগকে প্রায়ই জলে বাস করিতে দেখা যায়। কান্‌কাই খাঁটি জলচর প্রাণী-দিগের একমাত্র শ্বাসেন্দ্রিয়। সুতরাং মক্ষিকা স্থলচর প্রাণী হইলেও জলচর অবস্থায় উহার কান্‌কা (Gill) থাকাই সঙ্গত মনে হয়। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুসন্ধান করিয়া শিশু মক্ষিকাগুলির দেহে সত্যই কান্‌কা দেখিতে পাইয়াছেন। এই অবস্থায় মক্ষিকাশিশুগুলির দেহের দুই পার্শ্বে অতি পাত্‌লা এবং সূক্ষ্ম আঁশের মত কতকগুলি অংশ ধারা-বাহিক সজ্জিত থাকে। সাধারণ মৎস্যের কান্‌কার তন্তুগুলিতে যেমন সর্ব্বদাই রক্ত প্রবাহমাণ দেখা যায়, ঐ আঁশগুলির উপরে ঠিক সেইপ্রকার রক্তস্রোত অবিরাম চলিতে থাকে। সুতরাং উহাকে কান্‌কারই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। জলমিশ্রিত অক্সিজেন ঐ আঁশের উপকার রক্তের সংস্পর্শে আসিলেই তাহা দেহস্থ হইয়া পড়ে। মৎস্য প্রভৃতি জলচরগণ যেমন মুখবিবর হইতে অবিরাম জল বহির্গত করিয়া সর্ব্বদাই এক জল-প্রবাহ কান্‌কার উপর দিয়া চালাইতে পারে, মক্ষিকাশিশুগুলির দেহে সে প্রকার ব্যবস্থা না থাকিলেও, তাহাদের পুচ্ছগুলি কান্‌কার উপর দিয়া জল চালাইবার অনেকটা সহায়তা করে।

শ্বাস যন্ত্রের বৈচিত্র্য

মানুষ এই উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্রের বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ইহারা সকলেই ফুস্‌ফুস্ দ্বারা বায়ু হইতে অক্সিজেন-বাষ্প গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করে। প্রঞ্জের ন্যায় ছিদ্রবহুল এবং স্থিতি স্থাপক পদার্থ দ্বারা এই সকল ফুসফুস্ (Lungs) গঠিত। ছিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকায়, উহার অনেক অংশই বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া প্রচুর অক্সিজেন্-বাষ্প শোষণ করিতে পারে।

মেরুদণ্ডবিশিষ্ট নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্রের ব্যবস্থাও পূর্ব্বের অনুরূপ। তবে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদিগের ফুস্‌ফুসের ন্যায় ইহাদের ফুস্‌ফুসে অধিক ছিদ্র দেখা যায় না। এগুলি যেন কতকটা নিরেট ধরণের। ক্ষুদ্র দেহের পোষণের জন্য যেটুকু অক্সিজেনের আবশ্যক, ঐ সকল নিরেট ফুস্‌ফুস্ তাহা বায়ু হইতে অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারে।

মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্রে যে একটা ঐক্য দেখা গেল, অপর প্রাণীদিগের যন্ত্রে সে প্রকার একতা মোটেই দৃষ্ট হয় না। বহু বিচিত্র এবং অদ্ভুত উপায়ে ইহারা শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে।

মাকড়সার ফুস্‌ফুস্ আছে বটে, কিন্তু সেই যন্ত্রটি উহাদের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এতই বিচিত্র হইয়া পড়িয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে তাহাকে ফুস্‌ফুস্ বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদিগের ন্যায় ইহাদের দুইটি ফুস্‌ফুসের আবশ্যক হয় না। একটির দ্বারাই উহারা বেশ শ্বাসকার্য্য চালাইয়া লয়। তা ছাড়া সাধারণ ফুস্‌ফুসে যেমন অসংখ্য ছিদ্র দেখা যায়, ইহাদের ফুস্‌ফুসে সেগুলি পর্য্যন্তও থাকে না আঁশের ন্যায় কতকগুলি পাত্‌লা অস্থিময় ফলক উপর্য্যুপরি সজ্জিত থাকিয়া ইহার রচনা করে। শ্বাসগ্রহণ করিলে ঐগুলিই বায়ুতে পূর্ণ হয়,

এবং যন্ত্রের উপরে যে রক্তস্রোত সর্ব্বদা প্রবাহিত থাকে, তাহা ঐ বায়ু হইতেই অক্সিজেন শোষণ করে।

ভেক প্রভৃতি উভচর প্রাণিগণের শ্বাসযন্ত্র আরো অদ্ভুত। যখন সলাঙ্গুখ ব্যাঙাচির আকারে ইহারা জলচরের ন্যায় জলে বাস আরম্ভ করে, তখন শ্বাসগ্রহণের জন্য মৎস্যের কান্‌কার (Gill) ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র উহাদের দেহে সংলগ্ন থাকে। জলে-মিশ্রিত অক্সিজেন-বাষ্প সেই কান্‌কার সংস্পর্শে আসিলেই শরীরের রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে, উভচর প্রাণীগুলি একটু বড় হইলে, আর কান্‌কার দ্বারা শ্বাসগ্রহণ করে না। বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ শ্বাসযন্ত্র ক্রমে লোপ পাইয়া ফুস্‌ফুসের উৎপত্তি করিতে থাকে। পূর্ণবয়স্ক উভচরগণ সেই ফুস্‌ফুসের দ্বারা আমাদেরই মত বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শ্বাসকার্য্য চালাইতে শিক্ষা করে।

কান্‌কা ও ফুস্‌ফুসের মধ্যে আকারগত অনেক পার্থক্য থাকিলেও, উহাদের কার্য্যে সম্পূর্ণ একতা দেখা যায়। প্রাণিগণ যখন বায়ুর দ্বারা ফুস্‌ফুস্ পূর্ণ করিতে থাকে,' সেই বায়ুর অক্সিজেন রক্তে মিশিয়া যায়। জলে অধিক বায়ু মিশ্রিত থাকে না, যাহা একটু থাকে তাহাই ,দেহস্থ করিয়া জলচর প্রাণিগণকে জীবন রক্ষা করিতে হয়। স্থলচর প্রাণীসকল যেমন আকাশের বায়ু টানিয়া ফুস্‌ফুস্ পূর্ণ করিতে থাকে, উহারাও সেইপ্রকার পুনঃপুনঃ জল টানিয়া লইয়া কান্‌কার উপর দিয়া অবিরাম চালাইতে আরম্ভ করে। জলে যা একটু আধটু অক্সিজেন মিশ্রিত থাকে, কান্‌কার রক্ত তাহা এই সুযোগে প্রায় নিঃশেষে শোষণ করিয়া দেহস্থ করিয়া ফেলে।

পতঙ্গজাতীয় প্রাণীগুলির জীবনের ইতিহাস যেমন :বিচিত্রে, তাহাদের শ্বাসযন্ত্রও তেমনি অদ্ভুত। পতঙ্গের শ্বাসযন্ত্রের সহিত ফুস্‌ফুস্ বা কান্‌কার একটুও সাদৃশ্য দেখা যায় না। একপ্রকার অতি

সুরাসক্তি

আমাদের ক্ষুদ্র জগৎটিতে প্রতিদিন যে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহার মধ্যে বোধ হয় শতকরা নব্বুইটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। বাকি দশটি যদি কোনক্রমে দৃষ্টিতে পড়ে তবে অন্ততঃ আটটিকে আমরা তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিই।

এই অন্ধতা এবং তুচ্ছতাবোধ, অজ্ঞানতারই নামান্তর মাত্র। অজ্ঞতা মানুষকে কেবলমাত্র অন্ধ করে না সঙ্গে সঙ্গে গোঁজামিল দিবার একটা উৎকট ভাবকেও জাগাইয়া তোলে। নানাজাতীয় উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীসকল তাহাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ম যে প্রবল চেষ্টা করে, তাহা ডারুইন্ এবং ডাক্তার ওয়ালেসের নিকটই ধরা দিয়াছিল। সেটি পূর্ব্ববৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। যে দুই একজন ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জীবন-সংগ্রামটাকে পাপ-কলুষ জগতেরই একটা ধারা বলিয়া গোঁজামিলের চেষ্টা করিতেন। ডাক্তার ওয়ালেস্ এবং ডারুইন্ ব্যাপারটিকে ঠিক বৈজ্ঞানিকের ন্যায়ই দেখিয়াছিলেন এবং তাহাতেই আজ অভিব্যক্তি-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যে এক রহস্যময় প্রবলশক্তি তলে তলে কার্য্য করিয়া রুধির-সিঞ্চিত পথে জীবগণকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রাচীন পণ্ডিতদিগের নজরে পড়ে নাই।

কেবল জীবতত্ত্বের কথা আমরা বলিতেছি না। সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, জাতীয় সৌহার্দ্দাবন্ধন প্রভৃতি যে সকল ছোট-বড় বিষয়গুলিকে আমরা মানুষেরই হাতে-গড়া ব্যাপার বলিয়া মানিয়া আসিতেছি, অনুসন্ধান করিলে তাহাদের প্রত্যেকের মূলে এক একটা জীবন্ত শক্তিকে কার্য্য

করিতে দেখা যায়। মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমতা সেই শক্তিকে ধ্বংস করিতে পারে না; দমন করিয়া রাখিতে পারে মাত্র। দয়াদাক্ষিণ্য, হিংসাদ্বেষ, আচারব্যবহার প্রভৃতি যে সকল ব্যাপার দেখিয়া আমরা মানুষকে মানুষ বলিয়া চিনিয়া লই, তাহা সেই মহাশক্তিরই বিকাশ।

সুরাসক্তি আধুনিক মানব-সমাজে একটা দুষ্প্রবৃত্তি বলিয়া গণ্য হইলেও, ইহাকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কোটায় ফেলিবার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে আজকাল সচেষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে। ইতিহাসহীন অতি-প্রাচীন যুগে অসভ্য মানুষ যখন প্রকৃতির শিশুর ন্যায় অরণ্যে বিচরণ করিত, তখন তাহাদেরও সবল হৃদয়ে এই পাপবৃত্তি প্রবেশ করিতে ছাড়ে নাই। আধুনিক সুসভ্য মানুষের তো কথাই নাই। সুরাসক্তি আধুনিক সমাজে একটা মহা অকল্যাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাদ্রির উপদেশ, শাস্ত্রের বিধান, ইহাকে দমন করিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নষ্ট করিতে পারিতেছে না। যে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, তাহাকে আমাদের হাতের গড়া আচারব্যবহারে ঢাকা দিয়া রাখা যায় মাত্র! রাজার বা সমাজের শাসনদণ্ডের নিষ্পেষণে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।

সুরাসক্তির নিকটে শাস্ত্রের কঠোর বিধান এবং সমাজের ভ্রুকুটিকে ব্যর্থ হইতে দেখিয়াই আজকাল কতকগুলি বৈজ্ঞানিক এই কুপ্রবৃত্তিটাকে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত বৈজ্ঞানিকদিগেরই যুক্তিগুলির আলোচনা করিব।

জীবদেহমাত্রেই তরল ও কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত। বায়বীয় পদার্থ সেই শরীরে প্রবেশ করিয়া জীবসুলভ নানা কাজ দেখায়। কেবল কঠিনপদার্থময় জীব জগতে দুর্লভ। তরলপদার্থ না থাকিলে কোনক্রমে জীবনের কার্য্য চলে না। কাজেই, তরলপদার্থকে জীবদেহের একটি অতি-প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া মানিয়া লইতেই হয়।

ইহাদের পুচ্ছে সাধারণতঃ পক্ষীর ডানার মত তিনটি অংশ থাকে। মক্ষিকাশাবকগুলি সর্ব্বদাই এই ডানাগুলিকে আন্দোলিত করিয়া দেহের পার্শ্বস্থ সেই কান্‌কার উপর দিয়া অবিরাম জলপ্রবাহ চালাইতে পারে।

মশক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীও শৈশবে জলচর অবস্থায় থাকে। কোন ক্ষুদ্র পাত্র বা নর্দ্দমা ইত্যাদির জল বহুদিন আবদ্ধ থাকিলে তাহাতে বড় বড় পিনের মত যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণের চঞ্চল পোকা দেখা যায়, সেইগুলিই শিশু মশক। লম্বা দেহটিকে ক্ষণে ক্ষণে নানা ভঙ্গিতে বক্র করিতে করিতে উহারা সর্ব্বদাই জলের ভিতর বিচরণ করে, এবং এক একবার জলের ঠিক উপরে উঠিয়া শ্বাসযন্ত্রকে বায়ুতে পূর্ণ করিতে থাকে। ইহাদের দেহ পরীক্ষা করিলে কান্‌কার কোন সন্ধানই পাওয়াযয়া না। পতঙ্গদিগের দেহে যে নালিকাময় শ্বাসযন্ত্র (Spiracless)দেখা যায়, অনুসন্ধানে কেবল তাহারই অস্তিত্ব ধরা পড়ে। কাজেই, বলিতে হয়, শৈশবে জলচর হইয়াও মশকগণ জলের অক্সিজেন্ গ্রহণ করে না; অক্সিজেনের জন্য আকাশের বায়ুর উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এই কারণে শ্বাসযন্ত্রের নলিকাগুলিকে বায়ুপূর্ণ করিবার জন্য উহারা মাঝে মাঝে জলের উপরে ভাসিয়া উঠে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পতঙ্গজাতীয় প্রাণীর শ্বাসেন্দ্রিয়ে যে সকল নলিকা থাকে, তাহাদের কতকগুলির মুখ দেহের পার্শ্বে আসিয়া শেষ হয় এবং এই সকল ছিদ্রপথ দিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইলে নলগুলি বায়ুপূর্ণ হইয়া পড়ে। শিশু মশকের দেহ পরীক্ষা করিলে, ঐ প্রকার একটি মাত্র বায়ু-প্রবেশপথ তাহার পুচ্ছপ্রান্তে দেখা যায়। সুতরাং বলিতে হয়, শিশুকালে মশক কেবল পুচ্ছ দিয়াই শ্বাসকার্য্য চালায়। বায়ু গ্রহণ করিবার জন্য যখন মশকশিশুগুলি জলের উপরে উঠে, উহাদের পুচ্ছের ঐ কার্য্যটি তখন সুস্পষ্ট দেখা যায়। উহারা কখনই মস্তকগুলিকে জলের উপরে উঠায় না। বায়ুর আবশ্যক হইলে পুচ্ছের অগ্রভাগটিকে জলের উপরে রাখিয়া

কিয়ৎকাল স্থিরভাবে ভাসিয়া থাকে, এবং তা'র পর সেই নলিকাগুলি বায়ুপূর্ণ হইলে, আবার নীচে নামিয়া নানা ভঙ্গিতে বিচরণ সুরু করিয়া দেয়।

জগতের নানাজাতীয় অসংখ্য প্রানিমণ্ডলীর মধ্যে আমরা কেবল-মাত্র কয়েকটির শ্বাসযন্ত্রের একটা মোটামুটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাদের গঠনে যে বৈচিত্র্য এবং নিপুণতা দেখা গেল, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া যে এক মহাসঙ্গীত অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে, তাহারই সহিত তাল রাখিয়াপ্রত্যেক প্রাণীকে বিচরণ করিতে হয়! ইহাই প্রাণীর সজীবতা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার রক্ষার জন্য কাহাকেও একটুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় না। যে জগদীশ্বর সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সুনিপুণ হস্তে অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কীটেরও শ্বাসপ্রশ্বাস, আহার-নিদ্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। এই কারণেই জগৎ এত সুন্দর এবং আনন্দময়। জীবনরক্ষা এবং আনন্দের জন্য যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, প্রত্যেকপ্রাণী তাহা নিয়তই অযাচিতভাবে পাইতেছে। ইহাই বিধাতার আশীর্ব্বাদ।

জনশূন্য হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কারণ দেখা যায় না। প্রকৃতি দেবী তাঁহার সুনিপুণ হস্তে জীবকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিবেন যে, তখন আর জলের অভাবে জীবন রক্ষা করা তাহার পক্ষে কোন ক্রমেই অসম্ভব হইবে না।

প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত কোন্ ধারায় প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌দেহের পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা নানা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণে স্থির করিয়াছেন। সুতরাং ভবিষ্যতের পরিবর্ত্তনের সহিতে মিল রাখিতে হইলে, জীবদেহকে কি প্রকারে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা এখন অনুমান করা কঠিন নয়।

আমাদের কোন হাতে-গড়া জিনিষকে ছোট বা বড় করিতে হইলে, জিনিষটির আমূল পরিবর্ত্তন না করিয়া আমরা তাহাকে ছাঁটিয়া জুড়িয়া সংক্ষেপে প্রয়োজনসিদ্ধ করিয়া থাকি। প্রকৃতির কার্য্যে এই প্রকার ছাঁট-জোড়ার অভাব নাই। জলচর প্রাণী তাহার ফুল্‌কোর (Gills) ভিতর দিয়া জল চালাইয়া জলমিশ্রিত অক্সিজেন দেহস্থ করিয়া জীবিত থাকে। এই জলচর প্রাণীই যখন ক্রমোন্নতির প্রবাহে পড়িয়া স্থলচর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহার ফুল্‌কো আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া হঠাৎ ফুস্‌ফুসের আকার গ্রহণ করে নাই। প্রকৃতি সেই ফুল্‌কোকেই ছাঁটিয়া জুড়িয়া বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল।

আমরা এখানে কেবল একটি মাত্র উদাহরণের উল্লেখ করিলাম। জীবতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে প্রকৃতির অনেক কাজেই সংক্ষেপে কার্য্যসিদ্ধি করিবার এই প্রকার প্রয়াসের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। সুতরাং পৃথিবীর সমস্ত জল জমাট বাঁধিয়া বরফ হইয়া পড়িলে, জীবদেহের আমূল পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকিবে বলিয়া মনে হয়।

কি প্রকার পরিবর্ত্তনে জীবের শরীর রক্ষা হইবে, এখন আলোচনা করা যাউক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন প্রকার তরল পদার্থ দেহে না থাকিলে যে সকল রাসায়নিক কাজে জীবের জীবত্ব প্রকাশ পায়, তাহা এক প্রকার লোপ পাইয়া যায়। জলই এপর্য্যন্ত মিশ্রক পদার্থের কাজ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং যে উষ্ণতায় জল জমিয়া বরফ হয়, তাহাতে অপর কোনও তরলপদার্থ তরলাকারে থাকিয়া জলের কার্য্য চালাইতে পারে কি না, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে বিবেচ্য। বিশুদ্ধ জল যে শৈত্যে জমাট বাঁধে অবিশুদ্ধ বা লবণ-মিশ্রিত জলকে জমাইতে হইলে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক শৈত্যের আবশ্যক হয়। কিন্তু এই উভয় শৈত্যের পার্থক্য এত অল্প যে, সমগ্র জল জমিয়া বরফ হইয়া পড়িলে, লবণ-জল দ্বারা জীবদেহকে দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ন রাখা যাইবে বলিয়া কোন ক্রমে স্বীকার করা যায় না। মদ্য (Alcohol) জিনিষটাকে বরফ অপেক্ষা ১৩০০ অংশ পরিমাণে শীতল না করিলে জমানো যায় না অথচ ইহাতে জলের সমুদায় ধর্ম্মই একাধারে বর্ত্তমান। রাসায়নিক সংগঠনেও ইহা জলেরই অনুরূপ। এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, হয় তো পৃথিবীর সেই জলহীন ভবিষ্যজীবনে জীব-শরীরে কোন উপায়ে সুরা উৎপন্ন হইয়া জলের কার্য্য চালাইতে থাকিবে।

কিণ্বীভবন (Fermentation) ব্যাপারের কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন, প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবনের অনেক কার্য্য কেবল কিণ্ব দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুরা জিনিষটারও মূলে কিণ্ব বর্ত্তমান। একজাতীয় অতি-সূক্ষ্ম জীবাণু মিষ্ট এবং পক্ক ফলাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেই কিণ্ব জন্মাইয়া সুরার উৎপত্তি করে। সুরা উৎপন্ন করাই ইহাদের জীবনের কার্য্য। সুতরাং এই জীবাণুগুলি সুরা-কিণ্ব উৎপন্ন করিয়া নিজেদের দেহে সঞ্চিত রাখিতে সক্ষম হইলেই,

দেহে জীবনের যে সকল অদ্ভুত কার্য্য প্রকাশ পায়, তাহাদের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, আধুনিক পণ্ডিতগণ প্রত্যেকেরই মূলে এক একটি রাসায়নিক ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিলে জীবদেহকে এক একটি ক্ষুদ্র রসায়নাগার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। যে সকল অসংখ্য ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা জীবদেহ গঠিত, তাহাদেরি অতি সূক্ষ্ম অণুগুলির ভাঙ্গাগড়া লইয়া জীব সজীব। ইহাই বিজ্ঞানের মত। প্রাণী ও উদ্ভিদ্-দেহে এই ভাঙ্গাগড়ার বিরাম নাই। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই অঙ্গসকল ভাঙ্গিয়া গিয়া আবার নূতনভাবে সজ্জিত হইতেছে। দেহ যদি নিছক্ কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত হইত, তাহা হইলে শরীরের অণুরাশির এইপ্রকার নব নব বিন্যাস কখনই সম্ভব হইত না। প্রকৃতি এই কার্য্যটিকে সহজ করিবার জন্য জীব-দেহমাত্রেই প্রচুর তরল পদার্থ সঞ্চিত রাখিয়াছেন। ইহার অভাব হইলে জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য।

অত্যন্ত শীত বা অতিরিক্ত গরমে তরলপদার্থ তরলাকারে থাকিতে পারে না। এই দুই অবস্থায় তরল পদার্থমাত্রই জমিয়া কঠিন হইয়া পড়ে বা বায়বীয় আকারে উড়িয়া যায়। অধিক শীতে বা গরমে জীবের মৃত্যুর ইহাও একটি কারণ। সুতরাং যে সকল স্থানের তাপ বা চাপাদির পরিমাণ দেহের তরল পদার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, কেবল সেই সকল স্থানই প্রাণী বা উদ্ভিদের আবাসভূমি হইবার উপযোগী হয়।

পৃথিবীর অতীত জীবনের ইতিহাস সন্ধান করিলে দেখা যায়, এখানকার ধনজনপূর্ণ উদ্ভিদ্‌শ্যামল পৃথিবী, এককালে উষ্ণ দ্রবপদার্থ দ্বারা গঠিত ছিল। কালক্রমে দ্রবপদার্থ তাপ বিকিরণ দ্বারা জমাট বাঁধিয়া এখনকার জল-স্থল এবং শিলাকঙ্করের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু পৃথিবী এখনও তাহার সেই জন্মকালের তাপ নিঃশেষে বিকিরণ করিতে পারে নাই। এখন পৃথিবীর গড় উত্তাপ প্রায় ১৫° অংশ বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু তাপক্ষয়ের বিরাম নাই। সুতরাং দূর ভবিষ্যতে একদিন

আমাদের পৃথিবীখানি যে, তুষার অপেক্ষাও শীতল হইয়া পড়িবে, তাহা সুনিশ্চিত।

বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশে যে তুষার-মরু দেখা দিয়াছে, তাহাই দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া একদিন পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। তখন এখনকার নদনদী, সমুদ্র-হ্রদাদি জলাশয়ের এ প্রকার মূর্ত্তি থাকিবে না। জলমাত্রই জমাট বাঁধিয়া মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায় এক কঠিন আকরিক পদার্থের আকার পরিগ্রহ করিয়া ভূপ্রোথিত থাকিয়া যাইবে। সেই দূর ভবিষ্যতে বসুন্ধরা সত্যই জলশূন্যা হইয়া দাঁড়াইবে। বৈজ্ঞানিকদিগের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ হইবার নয়। আমাদের প্রতিবেশী চন্দ্রের কঙ্কালসার দেহখানি এই উক্তিরই পোষণ করিতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জলই যখন জীবদেহের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান, পৃথিবী জলবর্জ্জিত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌ও কি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না ?

আধুনিক পণ্ডিতগণ জীবজগতের এই প্রকার অপমৃত্যুতে বিশ্বাস করিতেছেন না। ইঁহারা বলিতেছেন, জীবদেহ যন্ত্রবৎ চলে বলিয়া তাহা কখনই আমাদের হাতে-গড়া যন্ত্রের ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয় নয়। সুগৃহিণী যেমন গৃহের কাজকর্ম্মের ব্যবস্থাটা অবস্থা বুঝিয়া স্থির করেন, প্রকৃতিদেবীও সেই প্রকার সুগৃহিণীর ন্যায়ই প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া জীবদেহের নানা ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্ত্তব্য বিধান করিয়া থাকেন। একা পৃথিবীই পরিবর্ত্তনশীল নয়। পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের সহিত মিল রাখিয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণও এক মহা পরিবর্ত্তনের প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। যতদিন পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন চলিবে, জীবদেহের পরিবর্ত্তনও অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকিবে। সুতরাং সমগ্র জল জমিয়া বরফ হইলে পৃথিবী

অব্যক্ত-জীবন

শ্বাসযন্ত্র ও হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ালোপ, দেহের শীতলতা, সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ হইলে আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে প্রাণীদিগকে মৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। শরীরবিদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা এই সকল স্থূল লক্ষণের উল্লেখ না করিয়া বলিবেন, সজীব প্রাণী বাহিরের বিবিধ পদার্থ নানা উপায়ে অবিরাম দেহস্থ করিয়া এবং দেহের নানা আবর্জ্জনা বাহিরে ছাড়িয়া, যে আদান-প্রদান চালায়, তাহাই জীবনের প্রধান লক্ষণ এবং ইহারই অভাব মৃত্যু। আরো সূক্ষ্ম লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে, তখন ইঁহারা শক্তির কথা আনিয়া ফেলেন। প্রাণিগণ খাদ্য হইতেই তাহাদের শক্তির আহরণ করে। যে শক্তি খাদ্যে অব্যক্ত ছিল, দেহযন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া তাহাই তাপ, গতি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি নানা শক্তিতে মূর্ত্তিমান্ হইয়া পড়ে। অব্যক্ত-শক্তিকে এই প্রকারে ব্যক্ত করাকেই শরীরবিদ্‌গণ জীবনের লক্ষণ বলিবেন, এবং তাহারই অভাবকে মৃত্যু বলিয়া প্রচার করিবেন।

জীবন-মৃত্যুর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলির সাহায্যে প্রাণিদেহ পরীক্ষা করিলে মোটামুটি কাজ চলিয়া যায় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে, ঐ গুলিই সময়ে সময়ে নানা ভ্রমের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অল্পদিন হইল স্পেনের কোন সহরে একটি বালিকার মৃত্যু হয়। দেহে মৃত্যুর স্থূল লক্ষণগুলিকে দেখিতে পাইয়া ডাক্তার মৃত দেহটিকে শবাধারে পূরিবার আদেশ দিয়াছিলেন। শবাধার সমাধিস্থলে লইয়াও যাওয়া হইল। কিন্তু মৃৎপ্রোথিত করার আবশ্যক হইল না। বালিকাটি সজীব হইয়া স্বহস্তে শবাধারের ডালা ভাঙ্গিয়া সকলকে চমকিত করিল। এই ঘটনার সত্যতায় সন্দিহান হইবার

কারণ নাই। যাঁহারা স্বচক্ষে ব্যাপারটি দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই নানা বৈজ্ঞানিক পত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই বলিতে হয়, জীবন-মৃত্যুর যে সকল সাধারণ লক্ষণ আমাদের জানা আছে, তাহা অভ্রান্ত নয়। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে এক অব্যক্ত-জীবন আছে, তাহা জীবনের সাধারণ লক্ষণগুলির দ্বারা ধরা পড়ে না।

প্রাণীর কথা ছাড়িয়া উদ্ভিদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, জীবন-মৃত্যুর লক্ষণে আরো গোলযোগ দেখা যায়। বাজার হইতে যে সকল বীজ লইয়া বপন করা যায়, তাহার সকলগুলি অঙ্কুরিত হয় না। কাজেই, বাহিরের আকার-প্রকার পরীক্ষা করিয়া যে বীজকে আমরা সজীব মনে করি, তাহা সত্যই জীবিত নয়। পাঠক হয়ত বলিবেন, অঙ্কুরিত হওয়াই বীজের সজীবতার লক্ষণ। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু এই লক্ষণ দ্বারা সজীবতা বুঝিতে গেলে, বীজকে নষ্ট করা হয়। প্রাণীর সজীবতা পরীক্ষা করিতে গিয়া যদি তাহার মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করা যায়, তবে পরীক্ষা সার্থক হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছুই লাভ করা যায় না। যে পরীক্ষায় জিনিষটি অবিকৃত থাকিয়া নিজের সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাই প্রকৃত পরীক্ষা।

আধুনিক জীবতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থে ঐ প্রকার তিনটি পরীক্ষার উল্লেখ দেখা যায়। কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের সজীবতা পরীক্ষা করিতে গেলে, তাহা অক্সিজেন্ এবং অঙ্গারক বাষ্প আদান-প্রদান করে কি না, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে দেখা হয়। তার পর দেহের তাপ পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বশেষে শরীরের কোন অংশে আঘাত দিয়া আহত ও অনাহত অংশের মধ্যে কোন বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিতেছে কি না, তাহা সূক্ষ্ম যন্ত্রসাহায্যে নির্ণয় করা হইয়া থাকে। প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ পচিতে আরম্ভ করিলে তাহা জীবনহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত

জলের অভাব মোচন হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। যে সময় বাহিরের শীতে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি শিলায় পরিণত হইবে, তখন ঐ সুরাই জীবদেহের একমাত্র তরলপদার্থ হইয়া জীবনের কার্য্য চালাইতে থাকিবে। দেহের উপাদানের এই প্রকার পরিবর্ত্তন নূতন ব্যাপার নয়। জীবতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে পদে পদে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। গন্ধক, ফস্‌ফরাস্, সিলিকন্ প্রভৃতি জিনিষগুলি অতীতযুগে জীবদেহের প্রধান উপাদান ছিল। এইগুলিকে প্রায় নিঃশেষে তাড়াইয়া, এখন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি মূলপদার্থগুলিই দেহের প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং জলের স্থানে সুরার আবির্ভাব বিচিত্র নয়।

এই সকল দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ভবিষ্যতে পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে জীবশরীরে স্বভাবতঃ সুরার উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব হইবে না। সুরাসক্তির ব্যাখ্যান দিতে গিয়া ইঁহারা ঐ সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াছেন। পৃথিবী যত শীতল হইতেছে, মানবদেহ ততই জল ত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে সুরার ন্যায় কোন একটা পদার্থকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখিতেছে। সম্ভবতঃ এই জন্যই গ্রীষ্ম প্রধান দেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশেই সুরাসক্তির এত প্রবলতা দেখা যায়।

যে প্রকার শীতল করিলে জল জমে, তৈলময় পদার্থকে জমাইতে হইলে শীতলতার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করার আবশ্যক হয়। সুতরাং যখন পৃথিবীতে জল থাকিবে না, তখন তৈলই তরল চর্ব্বির আকারে দেহে থাকিয়া রাসায়নিক কার্য্য চালাইতে পারিবে বলিয়া কতকগুলি পণ্ডিত অনুমান করিতেছেন। যখন মেরুপ্রদেশের সমগ্র জল বরফ হইয়া যায়, জীবসকল তখন চর্ব্বির দ্বারাই দেহের কার্য্য চালাইয়া বাঁচিয়া থাকে। এইজন্য মেরু প্রদেশের জীবকে বসাবহুল দেখা যায়। তৈলের এই কার্য্য চাক্ষুষ দেখিয়াও তাহা যে, স্থায়িরূপে জলের স্থান

অধিকার করিতে পারিবে, তাহা অপর পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। ইঁহারা বলিতেছেন, তৈল জমাইতে যে শৈত্যের আবশ্যক হয়, তাহা বরফের শৈত্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্র। সুতরাং যখন পৃথিবী অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়িবে, তখন তৈলেরও তরলাকারে থাকা সম্ভব হইবে না। এক সুরাকেই আমরা তখন তরলাকারে দেখিতে পাইব।

মনুষ্যজাতি প্রকৃতিদত্ত জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে সাধারণ ইতর প্রাণীর তুলনায় অনেক উন্নত হইয়াও প্রকৃতি-প্রণোদিত পাশব বৃত্তিগুলিকে বর্জ্জন করিতে পারে নাই। এইগুলিই প্রাণীর বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ সুরাসক্তিকে পাশববৃত্তির কোটায় ফেলিতে চাহিতেছেন। মানুষ তাহার উন্নত বুদ্ধির দ্বারা সংযম শিক্ষা করিয়া উহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে, কিন্তু একেবারে নির্ম্মূল করিতে পারিবে না। যে সমাজকে প্রকৃতি নিজের হাতে গড়িয়া তুলিয়াছেন, যদি কোন কাজে তাহারই অকল্যাণ হয়, তবে সেই কাজকে কখনই প্রকৃতির কাজ বলা যায় না। সুরাসক্তি সে সমাজের পরম শত্রু, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাকে কখনই প্রকৃতির দান বলা যায় না। মানুষ যে একটু বুদ্ধি ও জ্ঞান পাইয়া পশুত্বকে দমন করিতে পারিতেছে, তাহা বিপথগামী হইলে সমাজের অকল্যাণ উপস্থিত হয়। তখন সেই বুদ্ধিজ্ঞান কেবল পশুবৃত্তিরূপ অগ্নির আহুতিস্বরূপ হইয়া পড়ে। আধুনিক মনুষ্যসমাজে সুরাসক্তি যে কলঙ্কলেপন করিতেছে আমাদের বিপথগামীবুদ্ধিই তজ্জন্য দায়ী। যে সকল পশুপ্রবৃত্তি আমরা প্রকৃতি হইতে পাইয়াছি, তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখাই মানুষের মনুষ্যত্ব।

করার প্রথা আছে। কিন্তু ইহাকে কখনই মৃত্যুলক্ষণ বলা যায় না। ডিম্ব জিনিষটাকে প্রাণী বা উদ্ভিদ্ কোন জীবেরই কোটায় ফেলা যায় না। কাজেই, উহাকে নির্জীব বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়। অথচ মৃত পদার্থের ন্যায়ই ডিম্ব পচিতে আরম্ভ করে। কেবল ইহা দেখিয়াই যদি কেহ ডিম্বকে মৃত পদার্থ বলেন, তবে অন্যায় করা হয়। যাহা কোন কালে সজীব ছিল না, তাহা কখনই মৃত হইতে পারেনা। সুতরাং প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবন-মৃত্যু সাধারণ নিয়মে পরীক্ষা করিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত তিনটি পরীক্ষা অবলম্বন করা ছাড়া আর উপায় দেখা যায় না।

আজকাল জীবন-মৃত্যু লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত উপায়েই স্থির করা হইতেছে বটে, কিন্তু পরীক্ষাকালে ঐগুলিরও ব্যভিচার দেখা যায়। জীবমাত্রই কখন কখন এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়, যখন ঐ সকল পরীক্ষার কোনটিতেই তাহারা সাড়া দেয় না। রটিফার্ (Rotifer) নামক ক্ষুদ্র প্রাণীগুলিকে শুষ্ক স্থানে রাখিলে তাহারা বহু বৎসর ধরিয়া ধূলিকণার ন্যায় পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় পরীক্ষা করিলে, জীবনের কোন লক্ষনই দেখা যায় না। কিন্তু কয়েক মিনিটমাত্র জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহারাই নড়াচড়া করিয়া জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে। কেবল রটিফার নয়, ইহা ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র প্রাণীর এই প্রকার অব্যক্ত-জীবন দেখা যায়। এইগুলি আমিবা প্রভৃতির ন্যায় এককোষ জীব নয়। সাধারণ প্রাণীদিগের ন্যায় ইহাদেরও দেহে পাকযন্ত্রাদির সুব্যবস্থা আছে। সুতরাং বলিতে হয়, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অব্যক্ত-জীবন বলিয়া একটা অবস্থা ছোট বড় প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে।

যে সকল প্রাণীর রক্ত শীতল তাহাদিগের মধ্যে অব্যক্ত-জীবন বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায়। মেরুপ্রদেশের তুষাররাশির মধ্যে

যখন ভেক জমাট বাঁধিয়া থাকে, তখন তাহার দেহে জীবনের একটুও লক্ষণ দেখা যায় না। তা'র পর বরফ গলিয়া জল হইলেই, তাহারা সজীব হইয়া বিচরণ আরম্ভ করে। মেরুপ্রদেশের বরফের মধ্যে মৎস্য এমন জমিয়া যায় যে, একটু চাপ দিলেই তাহাদের দেহ ধূলির ন্যায় চূর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু গ্রীষ্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল মৎস্যই আবার সজীব হইয়া বরফ-গলা জলে আনন্দে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। সুপ্রসিদ্ধ মেরু-পর্য্যটক স্যাক্‌ল্‌টন্ সাহেব দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে বৎসরের মধ্যে প্রায় দশ মাস কাল কতকগুলি প্রাণীকে একেবারে নির্জীব অবস্থায় থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

উষ্ণ-শোণিতযুক্ত উন্নত প্রাণীর কথা আলোচনা করিলে ইহাদেরও অব্যক্ত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণেল টাউন্‌সেণ্ড্ নামক এক ব্যক্তির অদ্ভুত কার্য্যের কথা হয় ত পাঠক শুনিয়া থাকিবেন। ডব্‌লিনের ডাক্তার চেনিস্ (Cheynes) স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন, লোকটি ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারিত, এবং একটু চেষ্টা করিলেই আবার সজীব হইয়া পড়িত। যখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হইত, সত্যসত্যই তখন নাড়ী ক্ষীণতর হইয়া শেষে নিস্পন্দ হইয়া যাইত। এই অবস্থায় চিকিৎসকগণ হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া জীবনের একটুও লক্ষণ ধরিতে পারিতেন না আমাদের দেশের যোগীদিগের সমাধির অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনা যায়, তাহার বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। অধিক দিনের কথা নয়, রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে সাধারনের সম্মুখে সাধু হরিদাসের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ শুনিলে, মরা ও বাঁচার মধ্যে জীবনের যে একটা নিশ্চেষ্ট অবস্থা আছে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। আয়র্ল্যাণ্ডের টাউন্‌সেণ্ড্ সাহেবের ইচ্ছামৃত্যুর কথা সত্য হইলে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুতে, এবং রঘুবংশের রাজাদিগের "যোগেনান্তে তনুত্যজাম্" বিশেষণটিকে কেন অমূলক বলিব বুঝিতে পারি না সুতরাং দেখা

যাইতেছে, অব্যক্ত-জীবন মানুষ প্রভৃতি উন্নত প্রাণীদিগের মধ্যে খুব সুলভ না হইলেও, ব্যাপারটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

উদ্ভিদ ও জীবাণু প্রভৃতি অনুন্নত জীবের মধ্যে অব্যক্ত-জীবনের উদাহরণ সর্ব্বদাই দেখা যায়। যে বীজ শত বৎসর মৃতবৎ থাকিয়া মৃত্তিকায় পড়িলেই অঙ্কুরিত হয়, তাহার জীবন যে, এই দীর্ঘকাল ধরিয়া অব্যক্ত অবস্থায় সেই বীজেই ছিল, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। অধ্যাপক ম্যাক্‌ফ্যাডেন্ (Macfadyen) কতকগুলি ব্যাধি-জীবাণুকে তরল-বায়ুর শীতলতার মধ্যে রাখিয়াও একবারে নির্জীব করিতে পারেন নাই। তরল-বায়ুর উষ্ণতা বরফের উষ্ণতা অপেক্ষা প্রায় দুই শত ডিগ্রি কম। এই ভয়ানক শীতে জীবাণুগুলি এমন জমাট হইয়া গিয়াছিল যে, অঙ্গুলিস্পর্শে তাহারা ধূলির ন্যায় চূর্ণ হইয়া পড়িত, কিন্তু নির্জীব হয় নাই।

এখন অব্যক্ত-জীবনসম্বন্ধে আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ কি বলেন, আলোচনা করা যাউক। ইঁহারা বলেন, প্রাণ নামক কোন জিনিষ দেহের কোন বিশেষ অংশ নাই। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা জীবদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই জীবন বর্ত্তমান। কিন্তু সকলগুলি সমানভাবে জীবিত নয়। কাহারো জীবনের মাত্রা অধিক এবং কাহারো কম। প্রাণীদিগের নখদন্ত এবং কেশাদির বহিরাবরণ যে সকল কোষ দ্বারা গঠিত, তাহা আবার সম্পূর্ণ নির্জীব। দেহের সজীব কোষগুলির সমবেত জীবনীশক্তি যে প্রাণী বা উদ্ভিদে অধিক সেই জীবকেই আমরা খুব সপ্রাণ দেখি। সার্ উইলিয়ম্ রস্কোর ন্যায় কর্ম্মী পুরুষ এবং বায়ুরোগগ্রস্ত জড়বৎ ব্যক্তি উভয়েই সজীব বটে, কিন্তু সজীবতার মাত্রা দুইয়ে এক নয়। বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি সত্যই অল্প অক্সিজেন গ্রহণ করে, এবং অতি অল্প অঙ্গারক

বাষ্প ত্যাগ করে। ইহায় কেবল মস্তিষ্কই দুর্ব্বল নয়, পেশী, ত্বক, হৃদ্‌যন্ত্র, পাক-যন্ত্র প্রভৃতি শরীরের সকল অংশই নির্জীব দেখা যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবন এবং মৃত্যু এই দুই সীমার মধ্যে জীবনের নানা পর্য্যায় বর্ত্তমান। প্রাণী বা উদ্ভিদ যখন পুর্ণজীবন হইতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে ঐ সকল পর্য্যায়ের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। কিন্তু এগুলির সংখ্যা যে কত, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। আমরা সূর্য্যালোকের সেই মৌলিক সাতটি রঙ্‌কে চিনি। কিন্তু কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ণচ্ছত্রের (Spectrun) লাল রঙ্‌ পীত হইয়া দাঁড়ায় এবং পীত রঙ -বেগুণে হইয়া পড়ে, তার হিসাব চলে না। আমরা জীবনকে জানি এবং মৃত্যুকেও জানি, কিন্তু কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জীবনই মৃত্যু হইয়া দাঁড়ায়, তাহার হিসাব করিতে পারি না। শরীরবিদ্‌গণ জীবন ও মৃত্যুর মাঝেকার কোন এক অবস্থাকেই অব্যক্ত-জীবন বলিতে চাহিতেছেন।

জীবন ব্যাপারটা যে কি, তাহা আজও ঘোর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই কুহেলিকার আবরণ কোন দিন অপনীত হইবে কি না জানি না। যতদুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, যে সকল অণুদ্বারা দেহ গঠিত, তাহাদেরই সংযোগ-বিয়োগে বিশেষ বিশেষ শক্তিগুলি জীবনের কার্য্য প্রকাশ করে। এই সংযোগ-বিয়োগ আমাদের পরিচিত রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগেরই অনুরূপ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক জটিল। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবনী শক্তির এই রাসায়নিক ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, প্রাণী ও উদ্ভিদের অব্যক্ত-জীবন এবং দেহের অণুর নিশ্চেষ্ট অবস্থা একই ব্যাপার। অণুর সংযোগ-বিয়োগের ধর্ম্ম এই অবস্থায় লোপ পায় না, সুপ্তাবস্থায় থাকে মাত্র। তা'র পর তাহাই কালক্রমে ব্যক্ত হইয়া পড়িলে

জীবনের ক্রিয়াও ব্যক্ত হইয়া পড়ে। জীবের যখন মৃত্যু হয়, কেবল তখনি সেই সকল ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে যোগ রাখিয়া অণুগুলি যে সকল কার্য্য দেখাইত, তখন মৃত অণুতে তাহ' আর দেখা যায় না। সাধারণ জড়পদার্থের স্থূল রাসায়নিক-শক্তিগুলিই সেই অবস্থায় উহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, দেহের অণুগুলির চঞ্চলভাব অর্থাৎ জঙ্গমত্বই জীবন। ঘড়ির কাঁটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলে ঘড়িটিকে যেমন অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা যায়, সেই প্রকার দেহের জলীয় অংশকে টানিয়া লইলে বা তাপের মাত্রাকে কমাইয়া ফেলিলে অণুর জঙ্গমত্বের ক্ষনিক রোধ সম্ভব হয়। তা'রপর সেই বাধাগুলিকে নষ্ট করিলেই, ঘড়ির কলের ন্যায় দেহের কলটি আপনি চলিতে আরাম্ভ করে।

প্রাণিদেহে নানা প্রকার ঔষধের যে সকল ক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও আণবিক জঙ্গমত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণীকে অজ্ঞান করিতে হইলে ক্লোরোফরম্ প্রয়োগের রীতি আছে। জিনিষটা নিশ্চয়ই দেহের অণুর সংস্পর্শে আসিয়া রাসায়নিক কার্য্য সুরু করিয়া দেয়, এবং তাহারই ফলে সমগ্র অণু নিশ্চল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্কের অণুর নিশ্চলতায় রোগী সংজ্ঞাহীন হয় এবং হৃদ্‌পিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের নিশ্চেষ্টতায় মৃত্যু পর্য্যন্ত দেখা যায়। প্রুসিক্ এসিড্ (Prussic acid) জিনিষটা ভয়ানক বিষ। প্রাণীর শ্বাসযন্ত্রে অণুগুলিকে নিষ্ক্রিয় করাই ইহার কাজ।

জীবনীশক্তিকে রাসায়নিক কার্য্য বলিয়া মানিয়া লইয়াও জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অব্যক্ত-জীবনের ইহা ছাড়া আর কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ইতর প্রাণী বা উদ্ভিদ্ যখন শীতে জমাট বাঁধিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, আমরা তখন উহাদের দেহের আণবিক

নিশ্চলতার কারণ দেখিতে পাই। কিন্তু টাউনসেণ্ড বা সাধু হরিদাসের মত কোন এক ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় জীবনকে অব্যক্ত করে, তখন কোন মহাশক্তি দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অণুপুঞ্জের রাসায়নিক শক্তি অপহরণ করে, তাহা এখনো জানা যায় নাই।

বন ও বৃষ্টি

তরুলতাচিহ্নরহিত উন্মুক্ত প্রান্তর অপেক্ষা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অধিকতর বৃষ্টিপাত হয়,—এই কথাটা আমরা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু এই উক্তির মূলে কতটা সত্য আছে, বিজ্ঞানগ্রন্থে তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না।

বৃহৎ-দেশের বৃষ্টিবাত্যাদি-সম্বন্ধীয় অবস্থা যে ভৌগোলিক অবস্থান, বাণিজ্য-বায়ু (Tradewinds) প্রভৃতি স্থায়ী বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতের পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতশ্রেণীতে দক্ষিণ-পশ্চিমের বায়ুপ্রবাহচালিত মেঘরাশি বাধাপ্রাপ্ত হয়,—এবং তাহারই ফলে ঘাটসন্নিহিত স্থানে প্রচুর বারিপাত দেখা যায়। এই-জন্যই দক্ষিণাপথের বাষিক বারিপাত-পরিমাণ গড়ে ত্রিশ ইঞ্চির অধিক না হইলেও ঘাটের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের বারিপাত প্রায়ই ৮০ ইঞ্চিরও অধিক হইয়া পড়ে। কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্টস্থানের কয়েক বর্গমাইল-বিস্তৃত বনভূমি এবং ঠিক সেই স্থানেরই সম-আয়তন-বিশিষ্ট একটি উন্মুক্ত প্রান্তরের বার্ষিক বারিপাত-পরিমাণ তুলনা করিলে উভয়ে যে একতা দেখা যাইবে, এ-কথা কেহই বলিতে পারেন না,—পরীক্ষা করিলে বনাবৃতভূমির বারিপাত-পরিমাণ, উন্মুক্ত প্রান্তরে পতিত বৃষ্টির তুলনায় নিশ্চয়ই অধিকতর দেখা যায়।

এখন দেখা যাউক, বৃক্ষশূন্যস্থান অপেক্ষা বনভূমিতে অধিক বৃষ্টি-পাতের কারণ কি। পাটকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, মিছরি বা ফট্‌কিরি প্রভৃতি কোন দানাদার পদার্থ জলে মিশ্রিত করিলে এবং তাহাতে উক্ত পদার্থের মিশ্রণ প্রচুর হইলে, সেই পদার্থই আবার জলের মধ্যে আপনিই দানা বাঁধিয়া যায়। কিন্তু সেই মিশ্রিত পদার্থটাকে যদি স্থির রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাতে প্রায়ই দানা

সঞ্চিত হয় না ;—দানা বাঁধাইবার জন্য বাহির হইতে একটা উত্তেজনা আবশ্যক। সেই উত্তেজনা দ্বারা একবার দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিলে, জলমিশ্রিত সমস্ত পদার্থটা ক্রমে দানাময় হইয়া যায়। এইজন্য মিছরি প্রস্তুত করিতে হইলে, দানা উৎপাদনের উত্তেজনা-স্বরূপ একখণ্ড সূত্র চিনির রসে নিক্ষেপ করিতে হয় ; এবং প্রচুর ফটকিরি-মিশ্রিত জল হইতে জমাট ফটকিরি পুনরুৎপন্ন করিতে হইলে, মিশ্রপদার্থটাকে কিঞ্চিৎ আলোড়িত করা বা তাহাতে তজ্জাতীয় একখণ্ড দানাদার পদার্থ নিক্ষেপ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের অত্যুচ্চ বৃক্ষসকল, প্রচুরজলীয়বাষ্পপূর্ণ মেঘে,—সেই চিনির রসে নিক্ষিপ্ত সূত্রের ন্যায় কার্য্য করে। যখন আকাশের নিম্নস্তরস্থ বর্ষণোন্মুখ মেঘরাশি বায়ুপ্রবাহে চলিতে থাকে, বর্ষণের জন্য তখন ইহাতে আর নূতন বাষ্পসঞ্চারের আবশ্যক থাকে না ; বর্ষণারম্ভের জন্য কেবল একটা উত্তেজনার অভাব থাকিয়া যায় মাত্র। তার পর উচ্চ বৃক্ষশিরে আহত হইয়া সেই উত্তেজনা প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত মেঘই বনভূমিতে বর্ষণ করিতে থাকে।

এতদ্ব্যতীত যে কারণে বায়ুচালিত মেঘরাশি পর্ব্বতপার্শ্বে প্রতিহত হইয়া প্রচুর বারিবর্ষণ করে, সেঠাকেও আরণ্যভূমির বর্ষণাধিক্যের কারণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে,—এইপ্রকার বর্ষণ উপকূলস্থ বনভূমি ও আরণ্যবহুল দ্বীপে প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে।

এই ত গেল বাহ্যশক্তিজাত বর্ষণাধিক্যের কথা। ইহা ছাড়া বনভূমিতে অধিক বর্ষণের আরো কতকগুলি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রৌদ্রতাপে বনভূমির বৃক্ষপত্রাদি হইতে প্রতিদিন যে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া আকাশস্থ হয়; তাহার পরিমাণ এত অধিক যে, সেই বাষ্প মেঘাকারে পরিণত হইয়া বর্ষণ করিলে, তথাকার দৈনিক বারিপাতের পরিমাণ

প্রায় এক-ইঞ্চি হইয়া পড়ে। পত্রকাণ্ডাদি হইতে প্রতিদিন কি পরিমাণে জলীয়-বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা স্থির করিবার জন্য একটা সুন্দর পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই পরীক্ষায় প্রথমে কোন এক সজীব বৃক্ষশাখা একটা জলপূর্ণ বৃহৎ পাত্রে অহোরাত্র নিমজ্জিত রাখা হয় এবং পাত্রে কি-পরিমাণ জল আছে, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখা হয়। তা'র পর উক্ত সজীব শাখার শোষণের জন্য পাত্রের জল কতকটা কম পড়িল, তাহা ঠিক করা হইয়া থাকে। এই পরীক্ষাপদ্ধতিক্রমে গণনা করিলে দেখা যায়,—একটি পরিণত বৃক্ষ ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রতিদিনই প্রায় ৫৫ মণ জল পত্রমূলাদি দ্বারা শোষণ করিয়া লয় এবং ঠিক্ সেই পরিমাণ জলই প্রতিদিন বাষ্পাকারে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে।

স্থানীয় উষ্ণতা এবং পরীক্ষাস্থলের বায়ু ও আকাশের অবস্থা ইত্যাদির পরিবর্ত্তনের সহিত উৎপন্ন বাষ্পের পরিমাণও পরিবর্ত্তিত হয়,—এইজন্য পূর্ব্ববর্ণিত পরীক্ষালব্ধ গণনায় অল্পাধিক ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বৃক্ষের পত্রকাণ্ডাদি হইতে প্রতিনিয়তই যে প্রভূত জলীয়-বাষ্প আকাশস্থ হইয়া মেঘোৎপত্তির সহায়তা করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বৎসরের নানা সময়ে শীতপ্রধান দেশের অরণ্যতলের অবস্থা পরীক্ষা করিলে পূর্ব্বোক্ত উক্তির সত্যতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শীতকালে ঐ সকল আরণ্যভূমির অধিকাংশ স্থানই যেন সদ্যবর্ষণে সিক্ত থাকে, কিন্তু অপর ঋতুতে, এমন কি বর্ষাকালেও, তথায় তদ্রূপ আর্দ্রতা দেখা যায় না; বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ঋতুবিশেষে শীতপ্রধানদেশজ উদ্ভিদের জলশোষণশক্তির অত্যধিক হ্রাসবৃদ্ধি হয় বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত বিসদৃশ ঘটনাটি আমরা দেখিতে পাই। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সত্য, কিন্তু সেই ঋতুতে বৃক্ষাদির জৈবক্রিয়া পূর্ণভাবে চলিতে থাকে,

কাজেই, ভূশোষিত হওয়ার পর যে জল উদ্বৃত্ত থাকে তাহার সকলই উদ্ভিদমূল দ্বারা শোষিত হইয়া যায়; অরণ্যতলে জল সঞ্চিত থাকিতে পারে না। যদি তলসঞ্চিত জলের তুলনায় বৃক্ষের পত্রকাণ্ডাদিস্থ স্থান-অল্প হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও জলশোষণের বিরাম হয় না,—উদ্ভিদ্‌সকল স্বতই সদ্য-উদ্গত শাখাপত্রাদিতে ভূষিত হইয়া সমগ্র জলের স্থান-সংকুলান করিয়া লয়। এইপ্রকারে অতিবর্ষণ-সত্ত্বেও অরণ্যতল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের অধিকাংশ উদ্ভিদ্‌কে শীতের প্রারম্ভ হইতেইভ্রষ্টপত্র হইয়া সুপ্তাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়, এই সময়ে ইহাদের মূলে আর পূর্ব্ববৎ রসাকর্ষণশক্তি থাকে না,—কাজেই, সৌরকিরণে বাষ্পীভূত এবং ভূশোষিত হওয়ার পর, যে জল উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা ক্রমে সঞ্চিত হইইয়া অরণ্যতলটাকে আর্দ্র করিয়া তোলে। শোষণাভাবে বর্ষণবিরল শীতকালেও যে সকল বৃক্ষের তল পঙ্কিল হইয়া পড়ে এবং অজস্র-বারিপাত-সত্ত্বেও যে সকল বৃক্ষের জলশোষণশক্তিসাহায্যে বর্ষাকালেও বনভূমি শুষ্কপ্রায় থাকিয়া যায়, সেই সকল আরণ্যবৃক্ষ দ্বারা প্রতিদিন কত জল শোষিত হইয়া বাষ্পীভূত হইতেছে, তাহা বোধ হয় পাঠকপাঠিকাগণ এখন কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—অসংখ্য আরণ্যবৃক্ষ-পরিত্যক্ত উল্লিখিত বিশাল বাষ্পরাশি বনভূমিতে বর্ষণাধিক্যের আর একটা কারণ।

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন,—এক সীমাবদ্ধ স্থানের নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ বাষ্পরাশি জমাইয়া তরলীভূত করিবার স্থূলতঃ দুইটি উপায় আছে। প্রথম চাপপ্রয়োগ, দ্বিতীয় শৈত্যসংযোগ। একটা গোলকের মধ্যবর্ত্তী আবদ্ধ বাষ্প বরফ দ্বারা শীতল কর। শৈত্যের পরিমাণ প্রচুর হইলে বাষ্প জমিয়া যাইবে। আবার সেই বাষ্প সঙ্কুচিত করিয়া বা বাহির হইতে গোলকে আরো বাষ্প প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহার চাপবৃদ্ধি

কর, তাহা হইলেও দেখিবে, বাষ্প তরলীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আকাশ প্রচুর মেঘে আছন্ন, কিন্তু বর্ষণ নাই,— ইহার কারণও পূর্ব্বোক্ত চাপ বা শৈত্যের অভাব ব্যতীত আর কিছুই নয়। শীতল-বায়ু-সংস্পর্শাদি কারণে সেই বাষ্পরাশির তাপের হ্রাস হইলে বা নূতন বাষ্প সঞ্চারিত হইয়া তাহার চাপবৃদ্ধি করিলে, সেই মেঘেই আবার জলে পরিণত হইয়া বর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, উষ্ণতাধিক্য বা চাপস্বল্পতাপ্রযুক্ত বর্ষণের উনুপযোগী উল্লিখিত মেঘসকল যখন বায়ু-বিতাড়িত হইয়া বনভূমির উপর দিয়া ভাসিয়া যায়, আরণ্যবৃক্ষপরিত্যক্ত সেই প্রভূত বাষ্পরাশি তাহাতে সংযুক্ত হইয়া বর্ষণোপযোগী চাপের অভাব পূর করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তদ্দ্বরা বনভূমিতে প্রচুর বারিপাত হইয়া যায়।

বাষ্পীভূত হইবার সময় পদার্থমাত্রেরই তাপের ক্ষয় হয়—স্নানের পর গাত্রসংলগ্ন জল শারীরিক ও বাহ্য তাপে বাষ্পীভূত হইবার সময়, সেই তাপের অনেটা আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, এইজন্য আমরা স্নানন্তে বেশ একটা শৈত্য অনুভর করিতে পারি। সেই প্রকারে বৃক্ষপত্রাদিস্থ জলীয় অশং বাষ্পীভূত হইবার সময় আরণ্যভূমির উপরিস্থ বায়ুরাশির-অধিকংশ তাপই অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং কাজেই তদ্দ্বারা আরণ্যবায়ুতে একটা স্নিগ্ধতার উৎপত্তি হয়। এই স্নিগ্ধতা বনভুমির বর্ষণাধিক্যের অন্যতম কারনস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘরাশি ভাসিতে ভাসিতে বনভূমির উপরিস্থ সেই শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিবামাত্র শীতল হইয়া যায়,—কাজেই, এই অবস্থায় বনভূমিতেই অধিক বর্ষণ হইয়া পড়ে।

ভবিষ্যতের আহার্য্য

আহার্য্য-উৎপাদন একটা সম্পূর্ণ রাসায়নিক ব্যাপার। প্রাচীন রসায়নবিদ্‌গণ নানা জিনিষকে বিশ্লেষ করিয়া, সেগুলি কোন্ কোন্ মূল পদার্থের যোগে উৎপন্ন, তাহারই অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ আজকাল ঐ প্রকার অনুসন্ধান প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন। কি উপায়ে মূলপদার্থগুলি সংযুক্ত করিয়া নিত্য-ব্যবহার্য্য নানা দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারা যায়, এখন তাহারই আবিষ্কার ইঁহাদের গবেষণার চরম লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতিদেবী লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তাহার বিশাল কারখানায় যে সকল জিনিষ প্রস্তুত করিয়া ক্ষুধার্ত্ত জগতের সম্মুখে ধরিতেছেন, বৈজ্ঞানিকগণ সেই অনিশ্চিত ও অনিয়মিত দান গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা,—আহার্য্য-উৎপাদনের জন্য হলচালনা ও বীজবপন উঠিয়া যাউক; প্রকৃতি যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ ও অঙ্গারকে মিলাইয়া মিশাইয়া, ধান্য গোধূম মৎস্য মাংস ক্ষীর নবনীত প্রস্তুত করেন, আমরাও সেই প্রক্রিয়ার রহস্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারের ভিতর আহার্য্য প্রস্তুত করিতে থাকি। এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইলে, আমাদিগকে আর প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে না এবং দেশ "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" হউক বা না হউক, আর দেখিবার আবশ্যক হইবে না।

বৈজ্ঞানিক প্রথায় জিনিষমাত্রকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য জীবশরীর হইতে উৎপন্ন, তাহাদিগকে জৈবের (Organic) কোটায় ফেলা হয়। চিনি মাখম তৈল

চর্ব্বি ইহারা সকলেই জৈব পদার্থ। যে সকল বস্তুর উৎপত্তির মূলে জৈব পদার্থ নাই, তাহাদিগকে অজৈব (Inorganic) দ্রব্য বলা হইয়া থাকে। জল বায়ু লবণ পাথর প্রভৃতি অজৈব শ্রেণীভুক্ত।

অজৈব বস্তুকে বিশ্লেষ করা কঠিন নয় এবং যে যে মূল পদার্থের যোগে তাহাদের উৎপত্তি, সেগুলিকে একত্র করিয়া জিনিষগুলিকে নূতন করিয়া উৎপন্ন করাও চলে। সাধারণ লবণকে বিশ্লেষ করিলে সোডিয়ম্ ধাতু ও ক্লোরিন বাষ্পের সন্ধান পাওয়া যায়। সোডিয়ম্ ও ক্লোরিন একত্র কর, লবণের উৎপত্তি দেখিতে পাইবে। কিন্তু জৈব পদার্থকে বিশ্লেষ করা ও তাহাকে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা বড় কঠিন ব্যাপার।

প্রাচীন রাসায়নিক পণ্ডিতগণ জৈব পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল, বুঝি জৈব পদার্থের বিশ্লেষই অসম্ভব। আধুনিক বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় প্রাচীনদিগের অকৃতকার্য্যতায় হতাশ না হইয়া উন্নত-যন্ত্রাদি সাহায্যে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং গত শতাব্দীর শেষভাগে তদ্দ্বারা অনেকগুলি জৈব পদার্থের গঠনোপাদান আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কার্পাস ও শ্বেতসার (Starch) প্রভৃতি জৈব পদার্থগুলির রাসায়নিক গঠন খুব জটিল নয়, কিন্তু এগুলির বিশ্লেষণেও বৈজ্ঞানিকগণকে বৎসরের পর বৎসর কঠোর শ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রোটোপ্লাসম্ Protoplasm) নামক যে রহস্যময় পদার্থ দ্বারা জীবদেহ গঠিত, তাহা যে কোন্ কোন পদার্থযোগে উৎপন্ন, অদ্যাপি নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। এই প্রকারে অনেক জটিল জৈব পদার্থের গঠনোপাদানের পরিমাণাদি আজও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তবে জৈব পদার্থে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অঙ্গার ইত্যাদি ব্যতীত যে, অপর কোনও মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব নাই, তাহা বহু পরীক্ষায় নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।

আশী নব্বইটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে কেবলমাত্র চারিটির বিচিত্র সংযোগে পশুপক্ষী, তরুলতা প্রভৃতি জৈব পদার্থমাত্রেরই উৎপত্তি দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, মূল উপাদানগুলি লইয়া জৈবপদার্থের উৎপত্তি করার সময় এখনো আসে নাই। নানা পদার্থকে বিশ্লেষ করাই এখন জৈব রসায়নবিদ্‌গণের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহারা মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিলেন,—যাহাদিগকে ভাঙ্গিতে এত কষ্ট, তাহাদিগকে সহজে গড়ানো যাইবে না।

কৃত্রিম জৈবপদার্থের উৎপত্তি ব্যাপারে বড় বড় পণ্ডিতগণকে হতাশ হইতে দেখিয়া, অনেক রসায়নবিদের উদ্যম ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল; এবং শেষে যখন জানা গেল, চিনি ও শ্বেতসারের বিশ্লেষণে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ইত্যাদিকে যে যে পরিমাণে পাওয়া যায়, দধি ও কার্পাসের বিশ্লেষণেও অবিকল তাহাই দেখা যায়, তখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থের উৎপাদন অনেকেই অসাধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন। স্থির হইল,—উপাদান একত্র করিলেই জৈববস্তুর উৎপত্তি হয় না; ইহাদের উৎপত্তির মূল একটি প্রাকৃতিক শক্তি বর্ত্তমান। সেই শক্তির রহস্য না জানিয়া পরীক্ষাগারে জৈবপদার্থের উৎপাদন-চেষ্টা বৃথা। বৈজ্ঞানিকেরা ঐ কল্পিত প্রাকৃতিক শক্তিকে "জীবনীশক্তি" (Vital Force) আখ্যা দিলেন। বৈজ্ঞানিকের দল হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,— "জীবনীশক্তিকেই" জৈব বস্তুর মূল উৎপাদক বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

আধুনিক রসায়নবিদ্‌গণের নেতা সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত বাঁৎলো (Berthelot) সাহেব তখন নবীন উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন মাত্র। "জীবনীশক্তির" কুহক এই তরুণ বৈজ্ঞানিককে ভুলাইতে পারিল না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—জৈবপদার্থের গঠনের মূলে প্রাকৃতিক শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কোনক্রমে অজ্ঞেয় বলা চলে না। এ প্রকার

কোনও প্রাকৃতিক ব্যাপার নাই, যাহার কারণানুসন্ধানে ফল লাভ করা যায় না। বৈজ্ঞানিকদিগের তর্ককোলাহলে কর্ণপাত না করিয়া বাঁৎলো সাহেব সংগঠনবিদ্যার (Synthetic Chemistry) প্রতিষ্ঠার জন্য ধ্যান-মগ্ন ঋষির ন্যায় গবেষণা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বাঁৎলো সাহেবের কঠোর সাধনায় শীঘ্র সিদ্ধির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। গ্লিসারিন্ (Glycerine) একটি জৈববস্তু। তিনি সর্ব্ব প্রথমে এই জিনিষটাকে বিশ্লেষ করিয়া তাহার পুনর্গঠনের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শত শত জৈবপদার্থের সংগঠনরহস্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাঁৎলো সেই গ্লিসারিন্ হইতেই মদ্যের (Alcohol) উৎপত্তি দেখাইতে লাগিলেন এবং কয়লার বাষ্প (Ethylene) হইতে ফর্‌মিক্ এসিড্ (Formic Acid) উৎপন্ন করিলেন। এই এসিড কেবল পিপীলিকার দেহ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ জানিতেন, কোন কৃত্রিম উপায়ে যে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ কল্পনাই করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত চিনি ও চর্ব্বির উৎপত্তি-রহস্যও একে একে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। বাঁৎলোর অদ্ভুত আবিষ্কার-সমাচারে ছোট-বড় সকল বৈজ্ঞানিকও অবাক্ হইয়া গেলেন।

পাঁচ বৎসর গবেষণার পর উক্ত বৈজ্ঞানিক মহাশয় প্রকাশ্যভাবে বলিতে লাগিলেন—এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ জৈবপদার্থের উৎপত্তির মূলে যে এক "জীবনীশক্তি" দেখাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেপ্রকার "জীবনী-শক্তি" জগতে কিছুই নাই ; ঐ কথাটাকে গড়িয়া নিজেদের অজ্ঞতাকে চাপা দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। এক রাসায়নিক শক্তিই এই জীবরাজ্যের বিচিত্রতার মূল কারণ এবং তাহা পূর্ণমাত্রায় জ্ঞেয়। বাঁৎলো সাহেব নিজের পরীক্ষাগারে বসিয়া বসিয়া কৃত্রিম চিনি, রেশম, নীল, নানাপ্রকার রঙ ও গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বৈজ্ঞানিকগণকে চমকিত করিয়া দিলেন।

এগুলি পূর্ব্বেকার কথা। পরে বাঁৎলো সাহেব যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা আরো বিস্ময়কর। কোনপ্রকার সার না দিয়া, জমিতে এক প্রকার জীবাণু ছাড়িয়া দিলে, তাহাদের বংশবিস্তারের সহিত জমি কি প্রকার উর্ব্বর হয়, তাহার কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। গাড়ি গাড়ি সার দিয়া হলচালনা না করিলে যে ভূমিখণ্ডে শস্য জন্মিত না, এখন অঙ্গুলিপ্রমাণ কাচনলিকাস্থিত কয়েকটি জীবাণু দ্বারা তাহা উর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে। বাঁৎলো সাহেবই এই নূতন কৃষিপদ্ধতির আবিষ্কারক। ইনি বলেন, শাক্-সব্জি, শস্য-ফলাদি উৎপাদনের জন্য আর ভূমিকর্ষণের বা জীবাণুরও আবশ্যক হইবে না। যে চারিটি মৌলিকপদার্থের যোগে আমাদের খাদ্যদ্রব্য ও নানা জৈব-পদার্থের উৎপত্তি হয়, জগতে তাহার অভাব নাই। আমাদের হাইড্রো-জেন্ ও অক্সিজেনের অভাব বায়ু ও জল পূরণ করিবে, অঙ্গার ভূগর্ভে প্রচুর পরিমাণে আছে, এবং নাইট্রোজেন আমরা বায়ু হইতেই পাইব। এখন এই চারিটি পদার্থকে যথোপযুক্তরূপে সংযুক্ত করিতে পারিলেই আমাদের আর খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুল হইবে না। মোদক যেমন ঘৃত ছানা চিনি ইত্যাদি উপাদান দ্বারা নিপুণতার সহিত নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া থাকে, অনায়াসলব্ধ প্রচুর উপাদানসাহায্যে আমরাও সেই প্রকারে মৎস্য মাংস শাক সব্জি ধান্য গম সকলি কারখানাতে প্রস্তুত করিতে থাকিব। জল বায়ু ও কয়লা হইতে হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন্ ইত্যাদি সংগ্রহ কবিতে প্রচুর শক্তির ব্যয় হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা এই শক্তি কোথা হইতে পাইব? এতদুত্তরে বাঁৎলো সাহেব বলিতেছেন, বিরাট্ শক্তির ভাণ্ডার সূর্য্যদেব আজও তাপ বিকিরণ করিতেছেন। সূর্য্যের তাপ সুকৌশলে শৃঙ্খলিত করিতে পারিলে শক্তির আর অভাব হইবে না। তা'ছাড়া ভূ-জঠরের অগ্নি আমাদের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতই রহিয়াছে।

বৃদ্ধ পণ্ডিত বাঁৎলোর পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হঠাৎ শুনিলে বড় অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় এবং তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তিনি ইহা বুঝিয়া বারবার বলিয়াছেন,—কথাগুলার মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই। গত অর্দ্ধশতাব্দী কালে বিজ্ঞান যে দ্রুতপদক্ষেপে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কোন অভাবনীয় কারণে তাহা বাধাপ্রাপ্ত না হইলে, এখন যে সকল কথাকে অদ্ভুত শুনাইতেছে, তাহা আর দশবৎসর পরে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হইতে থাকিবে। নীল, রেশম, বাদাম ও দারুচিনির তৈল এবং কর্পূর ইত্যাদি দ্রব্য যে, কোন কালে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষাগারে প্রস্তুত হইতে থাকিবে, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে কোন বৈজ্ঞানিকই তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই; কিন্তু আজ সেই স্বপ্নাতীত ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলকাৎরা হইতে প্রস্তুত কৃত্রিম নীল এখন সত্য সত্যই স্বাভাবিক নীলের স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। বাদাম ও দারুচিনির তৈল এবং কর্পূর প্রভৃতি দ্রব্য বাঁৎলো সাহেব ত আজকাল স্বহস্তেই প্রস্তুত করিয়া দেখাইতেছেন। আতর বা গোলাপ জলের মত সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে এখন আর পুষ্পপত্রের আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না।

আমাদের প্রাত্যহিক, খাদ্যের ভিতর তৈল, বসা (Fat) এবং অঙ্গার-প্রধান (Carbohydrated) দ্রব্যই অধিক। তা'ছাড়া কতকগুলি নাইট্রোজেনযুক্ত খাদ্যও আছে। তৈল শর্করা ও অঙ্গারক জিনিষের গঠন-কৌশল বাঁৎলো সাহেব আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন এবং নাইট্রোজেনযুক্ত খাদ্য প্রস্তুতের কৌশলটিও শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশা দিতেছেন। কাজেই, মৎস্য-মাংস ডাল-ভাত প্রভৃতির অনুরূপ দ্রব্য যে আমরা শীঘ্রই পরীক্ষাগার হইতে পাইতে থাকিব, তাহাতে আর অবিশ্বাস করা চলিতেছে না। বাঁৎলো সাহেব আজকাল নাইট্রোজেন-যুক্ত খাদ্য প্রস্তুতের গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। ফরাসী

গবর্ণমেণ্ট একটি সুসজ্জিত বৃহৎ পরীক্ষাগার তাঁহার পরীক্ষা-সৌকর্য্যার্থে দান করিয়াছেন।

কৃত্রিম উপায়ে কোন জিনিষ প্রস্তুত হইলে অনেক সময়ে প্রস্তুত-ব্যয়ের বাহুল্য তাহাদের নিত্যব্যবহারের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কৃত্রিম হীরক ও রেশম ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ গুলি বহুকাল প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু বাজারে ইহারা স্বাভাবিক হীরক ও রেশমের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সুতরাং বৃদ্ধ বাঁৎলো সাহেবের বা অপর কাহারও উদ্যোগে মৎস্য-মাংসাদির অনুরূপ কোনও জিনিষ প্রস্তুত হইলেও প্রস্তুত-ব্যয় তাহাদিগকে নিত্যব্যবহারের উপযোগী করিবে কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ হয়; কেবলমাত্র ভূগর্ভ ও সূর্য্যের তাপ প্রস্তুত-ব্যয়ের লাঘব করিবে না। তা'ছাড়া কৃত্রিম খাদ্যের স্বাদগন্ধ কিপ্রকার দাঁড়ায়, তাহাও দেখিবার বিষয়। রাসায়নিক খাদ্যগুলি যদি কটুতিক্তরসযুক্ত হইয়া পড়ে, তবে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া আমরা চিরন্তন প্রথামতেই দধিদুগ্ধ-মৎস্য-মাংস সংগ্রহ করিতে থাকিব।

মাখন

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা আজ মনে পড়িয়া গেল। আমাদের বাড়ীতে এক গোপবধূ নিয়মিত দুগ্ধ জোগাইত। দুধ বেশ ভালই পাওয়া যাইত, কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া হঠাৎ দুধ খারাপ হইতে লাগিল। দুধে আর সে রকম মাখন উঠিল না এবং সে রকম পুরু হইয়া সরও পড়িল না। গোপজাতির সততার উপর সাধারণের বিশ্বাস বড়ই কম। আমারও খুব অধিক বিশ্বাস ছিল না। গোপবধূকে ডাকিয়া এক-চোট্ খুব বকিয়া দিলাম; মনে করিলাম, এই শাসনের ফলে পর দিন ভাল দুগ্ধ পাওয়া যাইবে; কিন্তু দুগ্ধ ভাল হইল না। গোপবধূ নানা প্রকারে জানাইল যে, তাহার দুগ্ধ খাঁটি এবং গাভীবিশেষের দুগ্ধে কখন কখন মাখন উঠে না। বলা বাহুল্য, আমি তাহার কথায় একটু বিশ্বাস করিলাম না। অর্থব্যয় করিয়া আর জল কিনিতে প্রবৃত্তি হইল না; পরদিবসই গোপবধূর হিসাব মিটাইয়া, স্থানান্তরে দুগ্ধ লইবার ব্যবস্থা করিলাম।

দুধে সর পড়ে নাই ও মাখন উঠে নাই বলিয়াই গোপবধূকে এত লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছিল এবং সেই কারণেই আমাদের বাড়ীতে তাহার প্রবেশাধিকার রহিত হইয়াছিল। আজ একখানি পুস্তকে পড়িতেছিলাম, কেবল মাখন ও সরের পরিমাণ হইতে দুগ্ধের ভালমন্দ বিচার করা চলে না। তাই আজ কঠোর বাক্যে জর্জ্জরিত গোপবধূর কথা মনে পড়িয়া গেল। হয় ত তাহার সততায় অবিশ্বাস করিয়া আমি অবিচার করিয়াছিলাম।

যদি কয়েকবিন্দু দুগ্ধ লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করেন, তবে পাঠক দেখিবেন, দুগ্ধ জিনিষটা জল বা তৈলের ন্যায় একটা সমঘন (Homogeneous) বস্তু নয়। ইহার সর্ব্বাংশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষাকার সাদা জিনিষ ভাসিয়া বেড়ায়। এইগুলিই দুগ্ধকে শ্বেতবর্ণ প্রদান করে। জলসাগুর ভিতরকার সাগুদানাগুলিকে আরো ক্ষুদ্র কল্পনা করিলে জিনিষটা যে প্রকার হয়, অণুবীক্ষণে দুধকে কতকটা সেই প্রকার দেখায়। এই সূক্ষ্ম জিনিষগুলিকে ঘৃতকোষ বলে। ইহার প্রত্যেকটিই ঘৃতে পূর্ণ। আমরা যখন মাখন প্রস্তুত করি, দুধের জলীয় অংশকে বর্জ্জন করিয়া এই কোষগুলিকেই সংগ্রহ করি এবং ঘৃত প্রস্তুত করিবার সময় তাপ-সাহায্যে সেই কোষগুলিকেই ফাটাইয়া ভিতরকার ঘৃত বাহির করি। তা'ছাড়া দুগ্ধ-ব্যবসায়ী যখন নির্ম্মমভাবে খাঁটি দুধে জল ঢালে, তখন সেইশ্বেত ঘৃতকোষগুলিই দূরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে বলিয়াই তাহার স্বাভাবিক রঙ্ রক্ষা করা দায় হইয়া উঠে।

বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, একশত ভাগ দুধে মোট সাড়ে তিন ভাগ ঘৃতকোষ থাকে এবং অবশিষ্ট সাড়ে ছিয়ানব্বুই ভাগের মধ্যে উননব্বুই ভাগে জল ও বাকীকয়েক ভাগে অপর কয়েকটি জিনিষ মিশানো থাকে।

কিছু দুধ একটি পাত্রে রাখিয়া ঝাঁকাইতে থাকিলে ঘৃতকোষগুলি তাহার সর্ব্বাংশে ছড়াইয়া পড়ে; কিন্তু ইহাকেই আবার কিয়ৎকাল অচঞ্চল অবস্থায় রাখিয়া দিলে, কোষগুলি একে একে উপরে উঠিয়া জমিতে আরম্ভ করে। জলে তৈল মিশাইয়া সমস্ত মিশ্র পদার্থকে ঘোলাইলে তৈল যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হইয়া জলের সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ঘৃতকোষগুলিও ঠিক সেই প্রকারে দুগ্ধের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত থাকে এবং কোন প্রকারে আলোড়িত না করিলে

উদাহৃত তৈলকণার ন্যায়ই সেগুলি দুগ্ধের উপরে আসিয়া জমা হয়। এই জলস্থিত ঘৃতকোষগুলিকেই আমরা অবস্থা-বিশেষে কখন সর এবং কখন মাখন বলি।

দুগ্ধ খাঁটি লও কোন দুগ্ধ হইতে অল্প এবং কোন দুগ্ধ হইতে অধিক মাখন পাওয়া যায় কেন, এখানে দেখা যাউক। পাঠক অবশ্যই জানেন, যে সকল জিনিষের ওজন ঠিক সমান আয়তনের (Volume) জলের ওজন অপেক্ষা লঘু, তাহাদিগকে কোনক্রমে জলে ডুবাইয়া রাখা যায় না। একখণ্ড কাষ্ঠকে জলে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দাও,—কাঠের নীচে ঠেলা দিয়া জল তাহাকে ভাসাইয়া দিবে। হিসাব করিলে দেখা যায়, জিনিষ ডুবিয়া যতটুকু জল স্থানান্তরিত করে, তাহারি ভারের অনুরূপ একটা ঠেলা পাইয়া নিমজ্জিত বস্তুমাত্রেই ভাসিতে চেষ্টা করে। কাঠ, সোলা প্রভৃতির ভার সম-আয়তন জলের ভার অপেক্ষা লঘু, তাই এগুলি জলে ভাসে। ধাতুপিণ্ডের ভার সম-আয়তন জলের ভার অপেক্ষা গুরু, তাই সেই জলের ঠেলা তাহাকে ভাসাইবার পক্ষে প্রচুর হয় না। কাজেই, ধাতুপিণ্ড ভাসিতে চেষ্টা করিয়াও ভাসিতে পারে না। ঘৃতকোষগুলি আপনা হইতেই দুধের উপরে আসিয়া ভাসে, সুতরাং এগুলি যে, দুধের জলীয় অংশ অপেক্ষা লঘু, তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ঘৃতকোষমাত্রই যদি তাহার পার্শ্বস্থ জলীয় অংশ অপেক্ষা লঘু হয়, তবে কোন কোন দুগ্ধ হইতে মাখন উঠানো অসাধ্য হয় কেন? ঘৃতকোষের অভাবকে ইহার কারণ বলা যাইতে পারে না। খাঁটি গো-দুগ্ধমাত্রকেই বিশ্লেষ করিলে প্রায় শতকরা সাড়ে তিন ভাগ ঘৃত কোষ পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অন্য প্রকার উত্তর দিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন, সকল দুগ্ধের ঘৃতকোষের আকার সকল সময় সমান থাকে না; বিশেষ বিশেষ সময়ে একই গাভীর দুগ্ধে

ঘৃতকোষ কখন বৃহৎ এবং কখন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়ায় এবং পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোষ ক্ষুদ্র হইলেই সেগুলি বড় কোষের ন্যায় অল্প সময়ে উপরে আসিয়া জমিতে পারে না। কাজেই, ক্ষুদ্র কোষময় দুগ্ধ হইতে মাখন প্রস্তুত করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কোষের আয়তনের সহিত তাহার ভাসা-না-ভাসার সম্বন্ধটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এখানে একটি ছোটখাটো গাণিতিক কথার অবতারণা আবশ্যক।

কথাটি এই যে, কোন গোলাকার জিনিষের ব্যাস যতই ছোট করা যায় তাহার পৃষ্ঠফল (Area of the Surface) ও আয়তনের (Volume) অনুপাত ততই বাড়িয়া চলে। মনে করা যাউক, একটি গোলকের ব্যাস তিন ইঞ্চি এবং অপর আর একটির ব্যাস দুই ইঞ্চি। হিসাবে বৃহত্তর গোলকটির পৃষ্ঠফল প্রায় ৫০ বর্গ-ইঞ্চি এবং আয়তন প্রায় সাড়ে তেত্রিশ ঘন-ইঞ্চি দেখা যায় এবং ঠিক সেই হিসাবে ক্ষুদ্রটির পৃষ্ঠফল ও আয়তন যথাক্রমে সাড়ে বারো বর্গ-ইঞ্চি ও সাড়ে চার ঘন-ইঞ্চি হইয়া পড়ে; সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৃহত্তর গোলকের পৃষ্ঠফল তাহার আয়তনের অপেক্ষা দ্বিগুণেরও কম; কিন্তু দ্বিতীয় গোলকটির পৃষ্ঠফল আয়তনের প্রায় তিন গুণ। গোলকের ব্যাস আরো ছোট থাকিলে তাহার পৃষ্ঠফল যে, আয়তন অপেক্ষা আরো বাড়িয়া চলিবে, পূর্ব্বের হিসাব হইতে আমরা তাহা বুঝিতে পারি। দুগ্ধের সেই ক্ষুদ্র কোষগুলি ভাসিয়া উঠার সহিত তাহাদের এই পৃষ্ঠফলের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কারণ, যে জিনিষের পৃষ্ঠফল তাহার আয়তনের তুলনায় যত অধিক হয়, পার্শ্বস্থ জল তাহার গতিরোধ করিবার ততই সুবিধা পাইয়া যায়। একখণ্ড রাঙ্গের পাতকে জলে ফেলিয়া পরীক্ষা করিলে, সেখানিকে অতি ধীরে ধীরে নীচে নামিতে দেখা যায়; কিন্তু সেই পাতখানিকেই বর্ত্তুলাকারে জড়াইয়া জলে ফেলিলে সেটি নিমেষে

তলাইয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, দুগ্ধের কোষগুলি যখন ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট হয়, তখন তাহাদের আয়তন যত কমে, পৃষ্ঠফল তত কমে না। কাজেই, উদাহৃত রাঙের পাত জলের তলায় নামিতে যে প্রকারে বাধা পাইয়াছিল, এখানে কোষগুলিও উর্দ্ধগমনে যে, ঠিক সেই প্রকারেই বাধা পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। ঘৃতকোষযুক্ত দুগ্ধ হইতে মাখন না পাওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ; সুতরাং দুগ্ধ হইতে মাখন বা সর পাওয়া গেল না বলিয়াই তাহাকে অবিশুদ্ধ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

যে দুগ্ধে বড় বড় ঘৃতকোষ থাকে তাহা মাখন প্রস্তুতের পক্ষে খুব উপযোগী। কিন্তু আজকাল আবার ক্ষুদ্র কোষময় দুগ্ধেরও উপযোগিতা দেখা যাইতেছে। চিকিৎসকেরা এই প্রকার দুগ্ধকে রোগীর সুপথ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাজেই, হাতের গোড়ায় ক্ষুদ্রকোষময় দুগ্ধ না পাইলে সাধারণ দুগ্ধের বড় কোষগুলিকে ভাঙ্গিয়া ছোট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। আমরা এখানে একটিমাত্র উপায়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিব। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ দুগ্ধ কাচের পিচ্‌কারির ভিতরে রাখিয়া পরে তাহাকে পিচ্‌কারির মুখ দিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। পিচ্‌কারির মুখের ছিদ্র অতি সূক্ষ্ম থাকে এবং অত্যন্ত বলপ্রয়োগ করিয়া পিচ্‌কারি চালাইতে হয়। দুগ্ধের বড় বড় কোষগুলি যন্ত্রের সংকীর্ণ মুখ দিয়া জোরে বাহির হইবার সময়ে ভাঙ্গিয়া গিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। সাধারণ দুগ্ধের প্রায় ১৬ হাজার কোষ পর পর সাজাইলে, তবে তাহাদের সমবেত দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চি হয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রমুখ-নির্গত দুগ্ধের কোষগুলি এত ছোট হইয়া যায় যে, তাহাদের অন্যূন পঁচিশ হাজারটি পর পর না সাজাইলে এক ইঞ্চি পূর্ণ হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই প্রকার দুগ্ধ হইতে কোনক্রমেই মাখন উঠান যায় না। পৃষ্ঠফলের তুলনায়

ইহার সূক্ষ্ম কোষগুলির আয়তন এত ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়ায় যে, লঘু উপাদানে গঠিত হইলেও, তাহারা পার্শ্বস্থ জলীয় অংশের বাধা অতিক্রম করিয়া কোনক্রমে উপরে উঠিতে পারে না। সাধারণ দুগ্ধ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষুদ্র কোষসম্পন্ন করা আজকাল আমেরিকা ও য়ুরোপের একটা ছোটখাটো ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রম ও অবসাদ

অভিব্যক্তিবাদ দ্বারা আজকাল যেন জড়বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব এবং নীতি ও সমাজবিজ্ঞানের নানা জটিল তত্ত্বের পূর্ব্বাপর ইতিহাস জানা যাইতেছে, সিদ্ধান্তটির প্রসার আরো একটু বৃদ্ধি করিয়া প্রাণীদিগের কর্ম্মসহিষ্ণুতা, অবসাদ ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকেও ইহার গণ্ডীর অন্তর্গত করিলে, সেই প্রকারে অনেক রহস্যের মীমাংসা হইয়া যায়। সুসভ্য মানুষ প্রতিদিন গড়ে যে শ্রম করে, তাহা ইতর প্রাণী বা কোন অসভ্য জাতিভুক্ত ব্যক্তির গড় শ্রম অপেক্ষা অনেক অধিক। সুসভ্য অসভ্য এবং উচ্চ নীচ প্রাণীর শ্রমশক্তির এই পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন—অবস্থাবিশেষে পড়িয়া যে জীবকে যত শ্রম করিতে দেখা যায়, তাহার বংশধরগণ ততই শ্রমসহিষ্ণু হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার পরেও পরিশ্রম-মাত্রা ক্রমে বাড়াইবার অবশ্যক হইলে সেই জাতি শ্রহসহিষ্ণুতায় জগতে অতুলনীয় হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানের মতে কেবল আবশ্যক অনাবশ্যক শ্রমই মানুষকে প্রাণিজগতে বড় করিয়া রাখিয়াছে। সুসভ্য ও অসভ্য জাতির মূল পার্থক্যও এই শ্রমসহিষ্ণুতায়। সহস্র বাস্তব ও কাল্পনিক কারণে সভ্য জাতি সদাসিধে অসভ্যগণ অপেক্ষা শ্রমে অধিক অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই অভ্যাসই বংশানুক্রমে জাতিমধ্যে সংক্রমিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কতকগুলি মানুষকে সাধারণ মনুষ্যজাতি হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, সভ্যসমাজস্থ কোনও লোক প্রতিদিন যে শ্রম করে, সে শ্রমভার কোনও অসভ্যের স্কন্ধে চাপাইলে, সে এক

দিনেই অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং কিছুকাল এই শ্রম চালাইলে শেষে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়। অবিরাম ভারবাহী পশু অপেক্ষা সুসভ্য বিলাসী মানুষ অধিক শ্রম করে, আবার মৃগয়াজীবী বলিষ্ঠ অসভ্যজাতি অপেক্ষা যানারোহী দুর্ব্বল নাগরিকের শ্রমের মাত্রা অধিক বলিলে, কথাটা হঠাৎ অসম্ভব শোনায়। শারীরিক শ্রমে বাস্তবিকই ইতর প্রাণী ও বর্ব্বর জাতি সুসভ্য মানুষকে পরাস্ত করে কিন্তু শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শ্রম লইয়া হিসাব করিলে সুসভ্য মানুষকেই প্রাধান্য দিতে হয়। পূর্ব্বে যে শ্রমের কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা শারীরিক ও মানসিক শ্রমের সমষ্টি সূচিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণের নিকট উভয়বিধ শ্রমই মূলে এক, এইজন্য প্রাণীদিগের শ্রমসহিষ্ণুতা তুলনা করিতে হইলে উভয় শ্রমের সমবেত হিসাব আবশ্যক।

শ্রমের মাপদণ্ড কি, এখন দেখা যাউক। সাধারণতঃ দেখিলে আমরা কার্য্যকেই শ্রমের পরিমাপক বলিয়া বুঝিয়া ফেলি, কারণ যে ব্যক্তি যত শ্রম করে, তাহার কৃত কাজের পরিমাণও তত বাড়িয়া উঠে। মানসিক শ্রমেরও সেই কথা—এই শ্রমের ফল মানুষের চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থাদি ও অপর কীর্ত্তিতে লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু এমন অনেক মানসিক ও শারীরিক শ্রম আছে, যাহা ঐ দুই পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। দার্শনিকের মানসিক শ্রমের অতিক্ষুদ্র অংশই তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, এবং পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের জীবনব্যাপী নানা চিন্তার কোন চিহ্নই লিপিবদ্ধ থাকে না। মানুষ যে শারীরিক শ্রম ব্যয় করিয়া সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল, তাহার কিঞ্চিৎ সাক্ষ্য অট্টালিকায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রতিদিনের সার্থক নিরর্থক চলা-ফেরা ইত্যাদি কারণে আমরা নিত্যই যে শারীরিক শ্রম করিতেছি, কার্য্যের দ্বারা তাহার পরিমাপ করা চলে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শারীরিক ও মানসিক শ্রম মূলে এক, কোন

বাহ্য অনুভূতি বা উত্তেজনা স্নায়ু ও মস্তিষ্কাদি সাহায্যে মানসিক কার্য্যে পরিণত হউক, বা সেই ব্যাপারটিই মেরুদণ্ড ও স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা মাংসপেশীর সজীবতা বৃদ্ধি করুক, উভয়ই যে একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ একং প্রাণিদেহের উপর উভয়েরই প্রভাব ও তাড়না যে সমান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই জন্য আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ শ্রমজনিত দেহের তাড়না ও ক্ষয়কে শারীরিক ও মানসিক উভয় শ্রমেরই মাপদণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শারীরিক ও মানসিক শ্রম যে একই ব্যাপার, তাহা দুই একটা উদাহরণ দিলে আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কোন কাজ করিবার সময় আমরা পেশী দ্বারা কতটা বল প্রয়োগ করি, তাহা স্থির করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র (Dynamometer) আছে। এই বলমাপক যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে. সুস্থ ও সবল লোক চক্ষু মুদ্রিত করিতে যে বলপ্রয়োগ করে, কোন একটা উজ্জ্বল পদার্থের উপর কিয়ৎকাল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া চক্ষু বুঁজিলে, লোকটি অজ্ঞাতসারে চক্ষুর পেশীতে তাহারো অধিক বলপ্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু পেশীতে এই বল অধিক কাল থাকে না, দুই চারি মিনিটের মধ্যে উহা ক্রমে কমিয়া আবার পূর্ব্বের পরিমাণ প্রাপ্ত হয়। উজ্জ্বল পদার্থ দর্শনে মস্তিষ্কের উত্তেজনাই আমাদের চক্ষুপেশীর ক্ষণিক বলবৃদ্ধির কারণ বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন। উজ্জ্বল বস্তুটিকে দৃষ্টি-বহির্ভূত কর, মস্তিষ্কের উত্তেজনা হ্রাস হইতে থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পেশীও নবসঞ্চারিত বল ত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িবে।

কোন বাহ্য উত্তেজনাসূত্রে, এই প্রকার শারীরিক বলবৃদ্ধির উদাহরণ আমরা প্রাত্যহিক জীবনে আরো দেখিতে পাই। পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন, আকস্মিক ক্রোধ-ভয়াদিতে অতি

দুর্ব্বল ব্যক্তিরও শরীরে এত বল বৃদ্ধি হয় যে, তাহার উৎপত্তির কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পণ্ডিতগণের মতে ক্রোধ-ভয়াদিজনিত মস্তিষ্কের উত্তেজনাই এই বল বৃদ্ধির কারণ। রণবাদ্যের তালে তালে সেনাদলের বহুক্ষণ ধরিয়া স্বাচ্ছন্দ্যগমন ও সুরের তালে ব্যায়ামকারিগণের নানা ক্লান্তিজনক ব্যায়াম কৌশল সহজে প্রদর্শন, সকলেরই মূলে পূর্ব্বোক্ত কারণ বর্ত্তমান। পীড়ায় মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে দুর্ব্বল রোগীর শরীরে সময়ে সময়ে যে প্রভূত বলের লক্ষণ দেখা যায়, ইহাও পূর্ব্বোক্ত উক্তির পোষাক আর একটা প্রমাণ। এই অবস্থায় শরীর দুর্ব্বল থাকে সত্য, কিন্তু মনের ক্রিয়া সবলে চলিতে থাকে; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া একই প্রকারের উত্তেজক শক্তির বিভিন্ন বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই, এই অবস্থায় রোগীর মানসিক উত্তেজনা শারীরিক কার্য্যে বিকাশপ্রাপ্ত হওয়া কোনক্রমে আশ্চর্য্যজনক নয়।

বর্ব্বর জাতি অপেক্ষা, সুসভ্য মানুষ যে অধিক শ্রমপটু, সভ্য-সমাজের শারীরিক ও মানসিক শ্রমের উত্তেজক ব্যাপারগুলির বৈচিত্র্যই ইহার কারণ বলা যাইতে পারে। আমাদের আহার-বিহার, গান-বাদ্য উৎসব-সংস্কার সকলই বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই কোন না কোন শ্রমের উৎপাদক। অসভ্য জাতি একটা চিরনির্দ্দিষ্ট সহজ ও একঘেয়ে উপায়ে জীবনটা কাটাইয়া দেয়; আহার্য্যসংগ্রহ ও উদরপূর্ণ করিয়া আহার করা তাহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ও বিলাসিতার চরম আদর্শ, সুতরাং এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যে শ্রমের আবশ্যক হয়, তাহার পরিণাম অতি অল্পই হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের পঠন-পাঠন, সঙ্গীতবাদ্য শ্রবণ ও চিত্রালেখ্য দর্শন, সকলই শ্রমের মাত্রা বৃদ্ধি করে। কাজেই, প্রভাত হইতে সুষুপ্তি কাল পর্য্যন্ত আমাদের শ্রমের বিরাম নাই, প্রেম জুগুপ্সা ঈর্ষা-দ্বেষের গুরুভার বহন করিয়া আমরা

ক্লান্ত হইয়া পড়ি। এই শ্রমভারে স্বভাবের শিশু বর্ব্বর ব্যক্তি যে অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা শরীরের মাংসপেশী সকল নানা ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া যেমন খুব দৃঢ় ও তাড়নসহিষ্ণু হইয়া দাঁড়ায়, সভ্যজাতি পুরুষানুক্রমে শত শত বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ তাড়নজনিত শ্রম সহ্য করিয়া সেই প্রকার শ্রমসহিষ্ণুতায় আজ জীবরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অভ্যাস ও পুরুষানুক্রমিক কার্য্যক্ষমতা প্রাণিশরীরকে খুব কর্ম্মঠ ও শ্রমসহিষ্ণু করে সত্য, কিন্তু দেহ ও মস্তিষ্ক সে পরিমাণে শ্রমবহনে অভ্যস্ত, তাহাতে তাহার অধিক শ্রম আরোপ করিলে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রান্তি আমাদের অতি-পরিচিত একটি ছোট কথা, কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্‌গণের নিকট কথাটা আজও ঘোর রহস্যময় রহিয়া গিয়াছে। সহজ কথায় বলিতে গেলে, শ্রান্তি-উৎপত্তির গূঢ় ব্যাপারটা আজও অজ্ঞাত আছে, বলা যাইতে পারে। লর্ড কেল্‌ভিন্‌ ও আমাদের স্বদেশ-বাসী বিজ্ঞানচার্য্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় চেতন-অচেতন, জৈব অজৈব পদার্থমাত্রেই অবসাদ লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। ধাতব তার সবলে টানিলে, তাহার দৈর্ঘ্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবে, গুরুচাপ প্রয়োগ কর—তাহার আকার বিকৃত হইয়া পড়িবে। কিন্তু তারের এই অবস্থা পরিবর্ত্তন স্থায়ী হয় না। টান ও চাপ উঠাইয়া লও, সেটা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, অধিকক্ষণ তারে এই প্রকার চাপ ও টান দিলে তাহার পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির আর ক্ষমতা থাকে না, ইহাই ধাতুর অবসাদ এবং প্রাণীর অবসাদের সহিত ইহার অবিকল মিল দেখা যায়। বাহিরের চাপ উঠাইয়া তারটিকে বিশ্রামের অবকাশ দাও, সেটি অচিরাৎ পূর্ব্বের স্থিতিস্থাপকতাদি ধর্ম্ম পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। এই প্রকার পরীক্ষায়

শ্রমাধিক অবসাদ ও বিশ্রামে ক্লান্তি-অপনোদনের লক্ষণ বস্তুমাত্রেই ধরা পড়িয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—তবে কি প্রাণিদেহের অবসাদ ও জড়-পদার্থের ক্লান্তি একই ব্যাপার? সাধারণ বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকট হইতে এই প্রশ্নের সদুত্তর আজও পাওয়া যায় নাই। বহু শ্রম দ্বারা সাধারণ জড়পদার্থের ন্যায় মাংসপেশীর ক্রিয়া ও আকুঞ্চনপ্রসারণশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু কোন কোন স্থলে এই অবসাদ লক্ষণ অনেক বিলম্বে আসিতে দেখা যায়। এই জন্য আধুনিক পণ্ডিতগণ জড়ের অবসাদ ও প্রাণিদেহের ক্লান্তিকে একশ্রেণীভুক্ত করিতে সংকোচ বোধ করেন। মাংসপেশীর অক্লান্ত পরিশ্রম, দ্বিচক্ররথারোহীর অবিরাম পদ আন্দোলনে এবং শ্রেণীবদ্ধ সেনাদলের দিবারাত্রি নিয়মিত গমনে বেশ বুঝা যায়। নিয়মিত পদক্ষেপে অভ্যস্ত হইলে সুপ্তাবস্থাতেও সেনাদলকে তালে তালে চলিতে দেখা গিয়া থাকে। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ প্রাণীর অবসাদকে সাধারণ জড়ের ক্লান্তি হইতে পৃথক করিয়া, মস্তিষ্ককেই প্রাণীর অবসাদের আধারস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেনাদল যখন সুপ্ত, মস্তিষ্কের যে অংশ দ্বারা গমনকার্য্য চলিতেছে সেটি তখন সুপ্ত নয়, কাজেই, কেবল মস্তিষ্কের উত্তেজনায় অনায়াসে গমনকার্য্য চলিতে থাকে।

এ পর্য্যন্ত অবসাদ ব্যাপারের এই অনুমানই প্রকৃত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন এবং তাহা ছাড়া শ্রম দ্বারা প্রাণিশরীরে অবসাদজনক কোনও কাল্পনিক পদার্থের (Fatigue-stuff) উৎপত্তিকেও ক্লান্তির মূল কারণ বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস ছিল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সম্প্রতি এই চিরাগত বিশ্বাসের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং সজীব-নির্জীব, চেতন-অচেতন পদার্থমাত্রেরই অবসাদের মূলে যে, কারণ বর্ত্তমান, তাহাও আচার্য্যবর প্রত্যক্ষ

পরীক্ষাদি দ্বারা দেখাইতেছেন। অবসাদ ব্যাপারে পণ্ডিতগণের এ পর্য্যন্ত যে নানা সন্দেহ ছিল, আচার্য্য বসুর আবিষ্কার দ্বারা বোধ হয় সেগুলি এবার নিরুক্ত হইবে।

বসু মহাশয়ের মতে মস্তিষ্ক বা সেই কাল্পনিক অবসাদজনক পদার্থের সহিত ক্লান্তির কোনই সম্বন্ধ নাই। মস্তিষ্কহীন বস্তু ও প্রাণী সকলই শ্রম ও অবসাদে একই নিয়মের অধীন।

অধ্যাপক বসু মহাসয়ের আবিষ্কারের এই অংশটা প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

অবসাদ

শ্রম ও অবসাদের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একেরঅস্তিত্বে আমরা অপরটির পরিচয় পাই। শ্রম করিলেই অল্পাধিক অবসাদ তাহার অনুসরণ করিবে এবং কাহাকেও অবসন্ন দেখিলে, কোন প্রকার শ্রমই যে, সেই ক্লান্তির উৎপাদক, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণকে অবসাদ-উৎপত্তির মূল কারণের কথা জিজ্ঞাসা কর। তাঁহারা বলিবেন,—প্রণী যখন শ্রমে নিযুক্ত থাকে, তখন অবস্থা-বিশেষে মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি শারীরিক অংশগুলির ক্ষয় আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই ক্ষয়ের পূরণ করিয়া শরীরিকে প্রকৃতিস্থ রাখার সুব্যবস্থা প্রাণিদেহেই আছে বলিয়া, অল্পশ্রমজমিত দৈহিক ক্ষয় প্রাণীকে অসুস্থ করিতে পারে না।

যন্ত্রমাত্রেরই কার্য্যোপযোগিতার একটা সীমা আছে; সেই সীমা অতিক্রম করিলে যন্ত্র বিকল হইয়া যায়। যে এন্‌জিন্ সহজে একখানি গাড়ি টানিতে পারে, তাহাকে ৪০ খামি গাড়ি টানিতে দিলে চাকা একবারও ঘুরিবে না। শারীরযন্ত্রের কার্য্যোপযোগীতারও ঐ প্রকার একটা সীমা দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের স্বাভাবিক শক্তি, যে শ্রমজাত ক্ষয়কে অতি অল্পকাল মধ্যে পূরণ করে, দ্বিগুন শ্রমজাত ক্ষয়কে সেই সময়ের মধ্যে পূরণ তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রাণী যখন ক্রমাগত কঠোর শ্রমে নিযুক্ত না থাকে, পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষয়ের পূরণ হয় না, কাজেই, শ্রমের কালের দীর্ঘতা অনুসারে সমবেত ক্ষয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই প্রকারে দৈহিক ক্ষয় যখন খুব অধিক হইয়া দাঁড়ায়, তখন প্রাণী আর শ্রম করিতে পারেনা। একদল বৈজ্ঞানিকের মতে ইহাই অবসাদের মূল কারণ।

অবসাদ-উৎপত্তির আর একটি সিদ্ধান্ত আছে। এই মতাবলম্বিগণ বলেন, শ্রম দ্বারা প্রাণীর কোনও অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় সঞ্চালিত হইলে তাহাতে স্বতঃই এক প্রকার অবসাদজনক পদার্থ (Fatigue Substance) উৎপন্ন হয়। ইহাদের মতে সেই পূর্ব্ববর্ণিত দৈহিকক্ষয় এবং এই অবসাদজনক পদার্থই ক্লান্তির মূল কারণ। উৎপত্তিমাত্র এই জিনিষটা যদি নিয়মিত শোণিতপ্রবাহ দ্বারা দেহ হইতে নিষ্কাষিত না হয়, তাহা হইলে সেটা প্রাণিশরীরে বিষবৎ অনিষ্ট করে। এতদ্ব্যতীত শারীরকোষের মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম ব্যবধানগুলিতে ঐ পদার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও কোষের জড়তা উৎপন্ন করে। ইহাদের মতে ঐ জড়তাই অবসন্ন প্রাণীর নির্জ্জীবভাবের কারণ।

আমাদের স্বদেশবাসী ভুবনবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় পূর্ব্বোক্ত প্রচলিত সিদ্ধান্ত দুইটির নানা প্রকার ভ্রম দেখাইয়া, অবসাদ-উৎপত্তির আর একটি মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।

ঐ পুরাতন সিদ্ধান্ত দুইটি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে, পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন, আধুনিক পণ্ডিতগণ একমাত্র রক্তকেই অবসাদনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই শরীরের সর্ব্বাংশে প্রবাহিত হইয়া দেহপুষ্টির উপযোগী পদার্থ বহন করিয়া আনে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসাদজনক পদার্থের (Fatigue Substance) ক্ষয় করে। অধ্যাপক বসু মহাশয় রক্তহীন পেশী পরীক্ষা করিয়া অবসাদের লক্ষণ দেখাইয়াছেন, এবং প্রাণী যেমন বিশ্রাম দ্বারা স্বভাবতঃ বিগতশ্রম হয়, তিনি শোণিতহীন পেশীরও তদ্রূপ অবসাদনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত চেতন, অচেতন, ধাতু উদ্ভিদ্‌বস্তুমাত্রেই বসু মহাশয় অবসাদের লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সকল স্থানেই একই নিয়মে অবসাদের অপনোদন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

শোণিত মাংসহীন নির্জীব ধাতুকে যদি প্রাণীর ন্যায় অবসন্ন হইতে দেখা যায়, এবং তাহার অবসাদ অপনোদনের উপায়ও যদি এক হয়, তবে দেহের ক্ষয় ও অবসাদজনক পদার্থের উৎপত্তিকে কি প্রকারে ক্লান্তির কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ বিবেচনা করুন। উদ্ভিদ্‌দেহে ও ধাতুপিণ্ডে ত রক্ত নাই তবে শোণিত-সঞ্চালনকেই বা কি প্রকারে অবসাদের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়?

অবসাদ-উৎপত্তির মূল কারণ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, চেতন-অচেতন, সজীব-নির্জীব পদার্থমাত্রেই বসু মহাশয় কি প্রকারে অবসাদ-লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন, দেখা যাউক। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, প্রাণীর সজীবতার লক্ষণ ধরিবার কতকগুলি উপায় আছে। ধমনীর স্পন্দন পরীক্ষা সেগুলির মধ্যে একটি। মুমূর্ষু রোগীর জীবন আছে কি না দেখিবার জন্য ডাক্তার আসিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার ধমনীস্পন্দন পরীক্ষা করেন। স্পন্দনের লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে, ডাক্তারি সিদ্ধান্তে রোগী মৃত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এটা মৃত্যু পরীক্ষার খুব প্রচলিত সহজ উপায় বটে, কিন্তু ইহাকে কোন ক্রমেই সূক্ষ্ম উপায় বলা যায় না,—কেবল নিজের স্পর্শশক্তির উপর নির্ভর করিলে জীবিতকে মৃত সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই অসম্ভব নয়। যাহা হউক সজীবতার পরীক্ষার ইহা অপেক্ষাও একটা সূক্ষ্ম উপায় আছে। প্রাণিশরীরের কোন পেশী বা স্নায়ুর দুই অংশে তার সংযুক্ত রাখিয়া তাহাতে আঘাত কর। পেশী সুস্থ ও সজীব থাকিলে, প্রতি আঘাতেই তাহার মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া, সেই তারের মধ্য দিয়া চলিতে দেখিবে এবং যদি সেই তারটির মধ্যে তড়িদ্‌বীক্ষণ (Galvanometer) যন্ত্র সংযুক্ত থাকে, তবে কি পরিমাণ আঘাতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সেই যন্ত্রের শলাকার বিচলন দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে। যে প্রাণী যত সবল ও সুস্থ থাকিবে, অল্প আঘাতে তাহার শরীরে তত প্রবল প্রবাহ

উৎপন্ন হইবে। মৃতপ্রায় প্রাণিশরীরে প্রচণ্ড আঘাত দাও, একটা ক্ষীণ বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎপত্তি দেখিবে। মৃত প্রাণিদেহে শত আঘাত দাও বিদ্যুতের অণুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পাইবে না।

পাঠকপাঠিকাগণ পূর্ব্বোক্ত তড়িৎপ্রবাহকে বৈদ্যুতিক শকটের চালক বা আলোকোৎপাদক প্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিবেন না। ঐ প্রবাহগুলি প্রায়ই অত্যল্পকাল স্থায়ী হয়। কোন প্রকার আঘাত উত্তেজনাপ্রাপ্তিমাত্র প্রাণিদেহে একটা ক্ষীণ প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া, সেটি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং তারপর বৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইলে প্রবাহটি আপনা হইতেই মৃদুতর হইয়া ক্রমে একেবারে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়।

অধ্যাপক বসু মহাশয় সজীব মাংসপেশীতে ক্রমাগত ঘন ঘন আঘাত প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন, প্রথমে প্রত্যেক আঘাতে প্রবলভাবে বৈদ্যুতিক সাড়া দিয়া, সেটি ক্রমে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, তখন প্রবল আঘাতে অতি ক্ষীণসাড়া ব্যতীত আর কিছুই তাহাতে দেখা যায় না। কিন্তু ইহার পর যদি পেশীটিকে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেটি সুস্থ হইয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল সাড়া দিতে থাকে।

অবসাদ কেবল শ্রমপরায়ণ প্রাণীরই ধর্ম্ম ভাবিয়া আধুনিক পণ্ডিত-গণ কি প্রকার ভ্রম করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার হইতে পাঠক তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। কেবল কল্পনা-সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ যে অবসাদজনক পদার্থ (Fatigue Substance) ইত্যাদির সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছিলেন, সেগুলি আমূল ভ্রমপূর্ণ।

অবসাদ-উৎপত্তির মূল কারণসম্বন্ধে অধ্যাপক বসু মহাশয় কি বলেন, এখন দেখা যাউক। সজীব মাংসপেশীতে আঘাত দিলে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়, সেটা ইঁহার মতে একটা আণবিক ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নয়। আঘাতাদি দ্বারা কোন পদার্থের এক অংশের

আণবিক বিন্যাস বিকৃত করিলে এই অংশের অণুগুলি প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য স্বতঃই সচেষ্ট হইয়া পড়ে। অধ্যাপক বসু মহাশয়ের মতে ইহাই আহত ও অনাহত স্থানের মধ্যেকার সেই তড়িৎ-প্রবাহের মূল কারণ। অবসাদও ঐ প্রকার এক শ্রেণীর আণবিক বিকৃতির ফল। চৈতন্য-অচৈতন্য বা সজীবতা-নির্জীবতার সহিত তাই অবসাদের কোন সম্বন্ধই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঘন ঘন আঘাত দ্বারা কোন পদার্থের আণবিক বিন্যাস বিকৃত কর; অবসাদ-লক্ষণ আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে।

এই আণবিক সিদ্ধান্তটি অধ্যাপক বসুর অনুমানমূলক উক্তি নয়। একখণ্ড ধাতুর এক অংশের আণবিক বিন্যাস কোন উপায়ে বিকৃত করিয়া তিনি বিকৃত ও অবিকৃত অংশের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের স্পষ্ট অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ইহা অপেক্ষা প্রত্যক্ষতর প্রমাণ-প্রয়োগ প্রকৃতই অসম্ভব।

অবসাদ-উৎপাদিক আণবিক বিকৃতিটা যে কি, তাহা বুঝিতে হইলে, অণুর উপর বাহ্য আঘাত-উত্তেজনার কার্য্যটা প্রথমে জানা আবশ্যক। অধ্যাপক বসু মহাশয় একটি সহজ যন্ত্র দ্বারা পদার্থের আভ্যন্তরীণ এই আণবিক বিচলন ব্যাপারটা বেশ বুঝাইয়াছেন।

যন্ত্রটি সূত্রসংলগ্ন একটি গোলক ব্যতীত আর কিছুই নয়। গোলকে ধাক্কা দিলে, অবস্থাবিশেষে তাহার যে প্রকার আন্দোলন দেখা যায়, কোন পদার্থে আঘাত দিলে তাহার অণুগুলির বিচলনও কতকটা তদ্রূপ হইয়া পড়ে। গোলকের একদিকে একটি মাত্র ধাক্কা দাও, পূর্ব্বের স্থির গোলকটি পুনঃপুনঃ উর্দ্ধোধোভাবে আন্দোলিত হইয়া ক্রমে স্থির হইয়া যাইবে। কোন পদার্থে আঘাত দাও, তাহারও অণু সকল পূর্ব্ববৎ আন্দোলিত হইয়া এবং ইহাতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করিতে করিতে শেষে স্থির হইয়া পড়িবে। চক্ষুর কৃষ্ণপর্দ্দার (Retina) উপর

পতিত আলোক দ্বারা, এই প্রকার পুনরান্দোলনের লক্ষণ বসু মহাশয় অনেক পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত গোলকের আন্দোলনের সময় যদি বালুকাপূর্ণ একটি পাত্র উহার সংস্পর্শে আনা যায়, তাহা হইলে গোলকটি বালুকার বাধায় আর পুনরান্দোলন করিতে পারে না। কারণ, ধাক্কা দ্বারা একবার উপরে উঠার পর নীচে নামিবামাত্র বালুকা গতি ক্ষয় করিয়া দেয়; কাজেই এক একটি আঘাতে তাহার একবার ঊর্দ্ধে গমন এবং একবার নিম্নে আগমন ব্যতীত আর আন্দোলন হয় না। পদার্থে আঘাত দিলে আমরা সাধারণতঃ যে, প্রতি আঘাতে এক একটি করিয়া বৈদ্যুতিক সাড়া পাই, অণুর পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আন্দোলনই তাহার কারণ।

এই ত গেল আঘাতজাত সাধারণ বৈদ্যুতিক সাড়ার কথা। পুনঃপুনঃ আঘাতে যে আণবিক বিচলন হয়, তদ্দ্বারা পদার্থের বৈদ্যুতিক সাড়া বৃদ্ধি না পাইয়া তাহা কি প্রকারে ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া অবসাদলক্ষণ প্রকাশ করে, এখন তাহা দেখা যাউক। প্রবল আঘাত প্রাপ্তির পর সেই উদাহৃত গোলকটি খুব ঊর্দ্ধে উঠিয়া যখন প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য সবেগে নীচে নামিতে থাকে, সেই সময় তাহাকে গতির বিপরীত দিকে একটি ধাক্কা দাও। এই সময়ে প্রদত্ত ধাক্কার অধিকাংশই সেই বেগবান গোলকটিকে মধ্যপথ হইতে বিপরীত দিকে ফিরাইতেই ব্যয়িত হইয়া যাইবে, ধাক্কার যে একটু বল অবশিষ্ট থাকিবে তদ্দ্বারা সেটি হয়ত একটু ঊর্দ্ধে উঠিয়াই আবার নীচে নামিতে আরম্ভ করিবে। ঘন ঘন আঘাত দ্বারা পদার্থের যে অবসাদ হয়, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আণবিক বিচলনই তাহার মূল কারণ বলিয়া অধ্যাপক বসু মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন পদার্থে ধীরে ধীরে আঘাত দাও, প্রথম আঘাতে বিচলিত হওয়ার পর অণু সকল যখন স্বাভাবিক স্থানে আসিয়া পড়ে, তখনই ইহারা দ্বিতীয় আঘাতের ধাক্কা পায়, কাজেই, সেই আঘাতে

অণুগুলি আবার সবলে বিচলিত হইতে পারে এবং তাহার ফলে নিয়মিত সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু ঘন আঘাতগুলির পরস্পরের মধ্যে কার ব্যবহিতকাল অতি অল্প, এজন্য প্রথম আঘাত দ্বারা যে আণবিক আন্দোলন হয়, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার পূর্ব্বেই অণুসকল তাহাদের গতির বিপরীত দিকে আর এক আঘাতের সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে। কাজেই, পূর্ব্ব-উদাহৃত নিম্নগামী গোলকের ধাক্কার ন্যায় এই আঘাতের অনেকটা শক্তি অণুগুলির গতি থামাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায় এবং যে একটু শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে অণুগুলির গতি সামান্যই বিচলন হয়। ঘন ঘন আঘাতে অণুর এই স্বল্প বিচলনই অবসাদের মূল কারণ।

অধ্যাপক বসু মহাশয়ের এই আবিষ্কারের বিবরণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স জর্ম্মানি প্রভৃতি দেশে নানা বৈজ্ঞানিক-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। এই সকল সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অভ্রান্ত যুক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিধাতা সৃষ্টির কোন জিনিষকেই যে, বিশেষ গুনসম্পদ দিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাহা আমাদের অতিবৃদ্ধ পিতমহগণ বেশ জানিতেন। তুচ্ছ বালুকণা হইতে আরম্ভ করিয়া ধীশক্তিসম্পন্ন মানব পর্য্যন্ত সকলেই একই অখণ্ড নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া শাসিত হইতেছে, তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। পিতামহগণের উপযুক্ত সন্তান জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কারগুলির দ্বারা সেই মহাসত্যের একটু সামান্য অংশ দেখাইয়াছেন মাত্র।

জৈব রসায়নের উন্নতি

জৈব রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, ইহাকে একটা সম্পূর্ণ নূতন শাস্ত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ সত্যই ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্ম মৃত্যু ও উন্নতি-অবনতি একটা সৃষ্টিছাড়া বিশেষ নিয়মে নিয়মিত হয় বলিয়া ইঁহাদের একটা বিশ্বাস ছিল এবং এই বিশ্বাসই তাঁহাদিগকে জৈব রসায়নের মূল তত্ত্বানুসন্ধানে নিরস্ত করিত। একই মহানিয়মের অধীন হইয়া যে, ধাতু-অধাতু জড়-অজড় সকল বস্তুই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করিতেছে, এই মহাসত্যটিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, সুতরাং ইহারা জীবরাজ্যের প্রণালীকে মানুষের দুরধিগম্য মনে করিতে পারেন নাই। গত কয়েক বৎসরে বৈজ্ঞানিকগণ নানা আবিষ্কার দ্বারা জৈব রসায়ন-শাস্ত্রের যে উন্নতি করিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। অতি অল্পদিনের মধ্যে ইঁহারা প্রায় দেড়লক্ষ জৈবপদার্থের বিশ্লেষ করিয়া, তাহাদের খুঁটিনাটি ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কার্য্য যে কত শ্রম ও কৌশলসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহার সুসাধন করিয়া বিজ্ঞানের একটা বৃহৎ অভাব মোচন করিয়াছেন।

শিল্পীর কৌশলে যেমন কেবল ইট, চুণ ও কাঠ সুদৃশ্য অট্টালিকায় পরিণত হয়, সেই প্রকার অঙ্গার, অক্সিজেন্ হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি কয়েকটি মূল পদার্থের অপূর্ব্বসম্মিলনে এই জীবজগতের গঠন হয়; প্রকৃতি যে কৌশলে প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টি ও পোষণ করিতেছেন,

তাহা আবিষ্কার করিয়া পরীক্ষাগারে জৈবপদার্থ প্রস্তুত করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগকে অভিভূত করিয়াছে। যে কৌশলে জড় জীব হইয়া দাঁড়ায়, কোন কালে তাহা বিজ্ঞানের আয়ত্তে আসিবে কি না, তাহা অবশ্যই এখন বলা চলে না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সহজ জৈব-পদার্থ প্রস্তুতের যে সকল উপায় জানা গিয়াছে, তাহা দেখিলে বৈজ্ঞানিকগণ যে, তাঁহাদের লক্ষ্যের অভিমুখে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন, তাহা বুঝা যায়।

জৈব পদার্থকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম, বসা অর্থাৎ চর্ব্বি; দ্বিতীয়, কার্ব্বোহাইড্রেড অর্থাৎ অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্-যুক্ত সামগ্রী; তৃতীয়, প্রটিন্স্ অর্থাৎ দেহের মাংসাদির প্রধান উপাদান।

বহুদিন হইল, ফরাসী বৈজ্ঞানিক বাঁৎলো (Barthelot) পরীক্ষাগারে কৃত্রিম চর্ব্বি প্রস্তুতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কৃত্রিম কার্ব্বোহাইড্রেড আজ প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া জর্ম্মাণিতে প্রস্তুত হইতেছে। চিনি জিনিষটা এই শ্রেণীভুক্ত। এখন কৃত্রিম শর্করা বাজারেও সুলভ। কিন্তু গত দশ বৎসরের চেষ্টাতে কেহ প্রটিন্ পদার্থটি প্রস্তুতের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। চেষ্টা নিরর্থক হয় নাই; জীবনের ক্রিয়ায় প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, তাহার প্রকৃতি এই চেষ্টায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। জীবনের ক্রিয়া ও রাসায়নিক ক্রিয়া যে অভিন্ন, এখন তাহা স্বীকার করিতেই হইতেছে; পুষ্টি, বৃদ্ধি, সন্তান-জনন প্রভৃতি সকল জৈব ব্যাপারেরই মূলে রসায়নের মূলতত্ত্ব বর্ত্তমান। কৃত্রিম জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ জীবতত্ত্বের যে সকল রহস্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানকে সত্যই যথেষ্ট লাভবান করিয়াছে।

জৈব পদার্থের এক শ্রেণীর উপাদানকে বৈজ্ঞানিকগণ সেলুলস (Cellulose) বলেন। ইহাতে কেবল অঙ্গার ও হাইড্রোজেনেরই প্রাধান্য দেখা যায়। গাছের ছাল, আঁশ, কাঠ, তুলা প্রভৃতি অনেক জিনিষ এই পদার্থে'ই গঠিত। কৃত্রিম সেলুলস্ প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন যে, ইহা দ্বারা কত ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এই সকল দ্রব্যের জন্য পূর্ব্বে মানুষকে যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। কাগজ, নির্ধূম বারুদ, কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম কেশ ও চর্ম্ম প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এখন কৃত্রিম সেলুলসের ব্যবহার হইতেছে।

বাজারে আজকাল নানা জাতীয় রঙের গুঁড়া অল্পমূল্যে বিক্রয় করা হয়, সেগুলিকেও জৈব রসায়নশাস্ত্রের উন্নতির উদাহরণ বলা যাইতে পারে। আল্‌কাত্‌রা হইতে এই সকল রঙ্‌ প্রস্তুত করা হয়। জর্ম্মাণি এই রঙের ব্যবসায়ে সকল দেশকে পরাজিত করিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায়, জৈব পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে গেলে, অত্যন্ত অধিক ব্যয় হয়; কাজেই, এই প্রকারে প্রস্তুত দ্রব্য বাজারে স্থান পায় না। কিন্তু রঙ্‌-সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলিতেছে না। আজকাল এত অল্প ব্যয়ে নানাজাতীয় কৃত্রিম রঙ্‌ প্রস্তুত হইতেছে যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহজাত রঙের আর আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না। শেফালি পলাশ বা ফুলের রঙে এখন আর কেহ বস্ত্র রঞ্জন করে না। জার্ম্মাণির রঙ্‌ এখন অলক্তক রসকেও নির্ব্বাসিত করিয়াছে। নীলের জন্য বিদেশে ভারতের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সুলভ কৃত্রিম নীল এখন নীলের চাষের উচ্ছেদ করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে আর নীলের আবাদ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রবার্ আধুনিক সভ্যতার একটা প্রধান উপকরণ। গাড়ীর চাকা, জুতার তলা, এবং গায়ের কোর্ত্তা প্রভৃতির প্রস্তুতে ইহার

যথেষ্ট ব্যবহার আছে। তা'ছাড়া কলকারখানার কাজে এবং সৌখীন ও খেলার জিনিষ প্রস্তুতে ইহার ব্যবহার অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ পর্য্যন্ত রবারের জন্ত রবার্ গাছের চাষ করিতে হইত। কাজেই, জিনিষটার মূল্যও বড় কম ছিল না। বহু চেষ্টার পর জর্ম্মাণির রসায়নবিদ্‌গণ কৃত্রিম রবার্ প্রস্তুতোপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। হিসাব করিলে দেখা যায়, প্রতি বৎসরেই এখন প্রায় কুড়িলক্ষ মণ রবারের ব্যবহার হইতেছে; ইহার মূল্য প্রায় তেইশ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, অল্পদিনের মধ্যে বাজারে সুলভ কৃত্রিম রবার্ দেখা দিবে। আজ দশ বৎসর হইল জর্ম্মাণ পণ্ডিত ডাক্তার হফ্‌ম্যান্ কৃত্রিম রবার্ প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন।

যে সকল প্রাকৃতিক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আমরা কাজ চালাই, সেগুলি সকল সময়ে ঠিক আমাদের মনের মত হয় না। কাজেই, নানা ব্যয়সাধ্য উপায়ে কার্য্যোপযোগী করিয়া সেগুলিকে কাজে লাগাইতে হয়। গাছের আঁশগুলি যদি কাগজের মত সাদা হইয়া জন্মাইত, তাহা হইলে কাগজ-প্রস্তুতের জন্ত তাহাদিগকে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আর সাদা করিতে হইত না। ইহার ফলে, বাজারে কাগজ সুলভ হইত। বিশেষ বিশেষ জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলিকে অবিকল প্রকৃতির অনুকরণে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন না, কৃত্রিম জৈব জিনিষগুলি যাহাতে ঠিক ব্যবহারোপযোগী হইয়া কারখানা হইতে বাহির হয়, তাহারি প্রতি সকলের দৃষ্টি থাকে রবার্ প্রস্তুত করিতে গিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ রবারের অনুরূপ আরো কতকগুলি নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন; শুনা যাইতেছে, এগুলি রবার্ অপেক্ষাও কার্য্যোপযোগী হইয়াছে।

কর্পূর জিনিষটা সম্পূর্ণ জৈব। জাপান সাম্রাজ্যের এবং ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের অনেক স্থানে কর্পূর বৃক্ষের চাষ করিয়া ব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়ায়

কর্পূর সংগ্রহ করা যাইত। বলা বাহুল্য, ইহাতে জাপানের যথেষ্ট লাভ ছিল। এখন বাজারে যে কর্পূর বিক্রয় হয়, তাহার বারো আনা কৃত্রিম। আকৃতি প্রাকৃতিতে ইহা অবিকল জৈব কর্পূরের অনুরূপ।

আজকাল স্ফটিক (Amber) জিনিষটা খুবই সুলভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিরুণী, চুরুটের নল, গলার হার প্রভৃতি অনেক জিনিষই আজকাল অবিকল স্ফটিকের ন্যায় অর্দ্ধস্বচ্ছ পদার্থ দিয়া গড়া হইতেছে। বলা বাহুল্য, এগুলি আকরিক স্ফটিক নয়; বহু পরিশ্রমে রসায়নবিদ্গণ কৃত্রিম স্ফটিক প্রস্তুতের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা দুর্লভ স্বাভাবিক স্ফটিককে নির্ব্বাসিত করিয়াছে।

জৈব রসায়নশাস্ত্রের উন্নতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানও কম লাভবান হয় নাই। অহিফেন বা তাম্রকূটসার প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌বিষ পূর্ব্ব উদ্ভিদ্ হইতেই সংগ্রহ করা যাইত। এখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাহা কারখানাতেই অতি সহজে প্রস্তুত করা হইতেছে।

প্রাণিশরীরে আড্রেনালিন্ (Adrenalin) নামক এক পদার্থ আপনা হইতেই সঞ্চিত হয়। জীবনের কার্য্যে ইহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শরীরের কোন অংশে বিশেষ কারণে রক্ত আবদ্ধ হইয়া পড়িলে, সেখানে এই পদার্থটা স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া রক্তের চাপ নিয়মিত করে। সম্প্রতি ডাক্তার ষ্টলজ্ (Stolz) নামক জনৈক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রাণিশরীরের এই পদার্থটিকে কয়লা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিয়াছেন। শরীরের কোন অংশে ইহার প্রলেপ দিলে, রক্তকোষগুলি সঙ্কুচিত হইয়া প্রলেপযুক্ত অংশটিকে প্রায় রক্তশূন্য করে। অস্ত্রচিকিৎসায় এই পদার্থটি বিশেষ সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অস্ত্রোপ্রয়োগে যখন বৃথারক্তপাতের আশঙ্কা হয়, চিকিৎসকগণ তখন দেহের রুগ্ন অংশে ইহার প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে রক্ত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কাজেই, অস্ত্র প্রয়োগে রক্তপাত হয় না।

জৈব রসায়নের উন্নতিতে গন্ধদ্রব্যের প্রস্তুত-বিধির এক যুগান্তর উপাস্থিত হইয়াছে। ফুল সংগ্রহ করিয়া শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া দ্বারা গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত-প্রণালী এখন প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। ফুলের যে অংশ গন্ধের উৎপাদক, তাহা বিশ্লেষ করিলে কতকগুলি মূল গন্ধ-দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এক গোলাপের আতরে এই প্রকার প্রায় কুড়িটি মূল গন্ধের মিশ্রণ আছে। রসায়নবিদ্‌গণ কৃত্রিম উপায়ে এই সকল মূল গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই প্রকারে প্রস্তুত গন্ধদ্রব্যগুলিকে নানা প্রকারে মিশ্রিত করিয়া ইঁহারা এখন শত শত সুন্দর গন্ধ-দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। কৃত্রিম সুলভ আতরকে এখন সত্যই স্বাভাবিক আতর হইতে পৃথক্ করা কঠিন। গত বৎসরে এক জর্ম্মাণি হইতে প্রায় ত্রিশ কোটি মুদ্রার গন্ধ-দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভূ-তত্ত্ব

দুষ্প্রাপ্যকে করায়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরকালই প্রবল। যাহা সহজ ও প্রত্যক্ষ, তাহার দিকে একবার না তাকাইয়া, প্রহেলিকাময় বৃহৎ জটিল ব্যাপার লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে আমরা স্বভাবতঃ ভালবাসি। জড়বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করিলে মানবের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায়ই সফলতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা কতকগুলি অতি-সহজ প্রাকৃতিক ব্যাপারকে যে, বহুকাল নিগৃহীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই নিগৃহীত ব্যাপারের মধ্যে ভূ-তত্ত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হার্সেল্ ও লাপ্লাস্ প্রমুখ বিজ্ঞানঋষিগণ যখন দূরবীণ্ খাটাইয়া, সৌর ও নাক্ষত্রিক রহস্যোদ্ভেদে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁহাদের পদচুম্বিত ধরাপৃষ্ঠের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিবর্ত্তনাদির বিষয় ইঁহারা বিশেষ কিছুই জানিতেন না।

সকল শাস্ত্রেই কল্পনা ও অনুমানের স্থান আছে প্রাচীন ভূ-তত্ত্বে এই নিয়মের ব্যাভিচার হয় নাই। প্রথমে ইহা কেবল কল্পনার আবর্জ্জনাতেই আমূল পূর্ণ ছিল। একদল পণ্ডিত বলিতেন, সৃষ্টির সময়ে পৃথিবী একটা বৃহৎ বরফপিণ্ডের আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তা'র পরে একটা ধূমকেতুর সংঘর্ষণে আসিয়া অবধি ইহার চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে এবং এই ধূমকেতুই পাহাড়পর্ব্বত বালুমৃত্তিকা ও প্রাণি-উদ্ভিদের জন্ম দিয়া পৃথিবীকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। কোথায় সেই ধূমকেতু, এবং সংঘর্ষণই বা কবে হইল, জিজ্ঞাসা করিলে বৈজ্ঞানিকগণ নিরুত্তর থাকিতেন। আর এক পণ্ডিত-সম্প্রদায় ঠিক করিয়াছিলেন,—সর্ব্বাগ্রে

পৃথিবীটা কেবল জল দিয়াই গঠিত ছিল এবং এই জলের উপরে মৃত্তিকা ও পাহাড়পর্ব্বতের উপাদান বাষ্পাকারে ভাসিয়া বেড়াইত। সেই ভাসমান পদার্থগুলিই ক্রমে জমাট বাঁধিয়া আধুনিক ভূ-পৃষ্ঠের রচনা করিয়াছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার সেই অবৈজ্ঞানিকযুগে স্বল্পভাষী গম্ভীর বিজ্ঞানবিদ্‌গণের উক্তির প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না, কাজেই, লোকে ঐসকল আজগুবি কথায় অবিশ্বাস করিত না।

ভূ-তত্ত্বের কথা বলিতে গেলেই প্রাচীন পণ্ডিতেরা বইবেলের সেই মহাজলপ্লাবনের কথা পাড়িতেন, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া নানা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত খাড়া করিতেন। কতকগুলি পণ্ডিত বাইবেলোক্ত জল-প্লাবনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন,—পৃথিবীর ভিতরটি আমূল কেবল জলেই পূর্ণ ; এই জলের উপরেই প্রথমে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছিল, তা'র পরে গুরুত্বাধিক্যপ্রযুক্ত মৃত্তিকা জলরাশির ভিতর ডুবিতে আরম্ভ করিলে সেই আভ্যন্তরীণ জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া মহা-প্লাবনের উৎপত্তি করিয়াছিল গোঁড়া খ্রীষ্টান্ গণ বাইবেলকে এই প্রকারে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে দেখিয়া খুব কোলাহল আরম্ভ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকমাত্রেই এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারেন নাই। কয়েকজন পণ্ডিত দল বাঁধিয়া নানা প্রতিবাদ করার পর, তাঁহাদের নিজের এক সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন।

ইঁহারা বলিতেন,—পৃথিবী আজকাল যেমন ইহার কক্ষার উপর দাঁড়াইয়া একটু তির্য্যক্‌ভাবে আবর্ত্তন করে, অতি-প্রাচীকালে পৃথিবীর অবস্থা সেপ্রকার ছিল না, তখন উহার মেরুদণ্ড ঠিক সোজাই থাকিত। তা'র পর কোন কারণে একদিন হঠাৎ পৃথিবী বাঁকিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই আকস্মিক অবস্থান-পরিবর্ত্তনে পৃথিবীর জলরাশিতে যে একটা প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই বাইবেলের মহাপ্লাবন।

তৃতীয় মতবাদী পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তটি আরও অদ্ভুত। ইঁহারা উল্লিখিত দুইটি সিদ্ধান্তকে উড়াইয়া দিয়া বলিতেন,—খুব সম্ভবতঃ একটা ধূমকেতু পৃথিবীর অতি-নিকটে আসিয়া তাহার সুদীর্ঘ পুচ্ছ দ্বারা ভূপৃষ্ঠের জলরাশি আলোড়িত করিয়াছিল, এবং এই আলোড়নজাত জলোচ্ছ্বাসই বাইবেলের বন্যা।

অষ্টাবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ কেবলকল্পনার সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত নানা আজগুবি সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়া ভূ-তত্ত্বকে একখানি উপন্যাস করিয়া তুলিয়াছিলেন। যুক্তিতর্কের দিকে না গিয়া ইঁহারা যথেচ্ছ বলিয়া যাইতেন, এবং যে সিদ্ধান্তটি যত অদ্ভুত ও অসম্ভব এবং উপন্যাসের মত হইত, সেইটিই তত লোকপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইত।

ভূ-তত্ত্বের এই ঔপন্যাসিক যুগে হটন্ (James Hutton) নামক জনৈক সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষাকালীন, ইনি প্রকৃত ভূ-তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ভূপৃষ্ঠের যে সকল পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, পূর্ব্ব-বৈজ্ঞানিকগণ ধূমকেতু প্রভৃতি সৃষ্টিছাড়া বস্তুর শরণাগত হইয়াছিলেন, কেবল কতকগুলি চিরপরিচিত প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে হটন্ সাহেব সেই সকল পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। কঠিন প্রস্তর যে, বৃষ্টিবাত্যা ও নানা রাসায়নিক কার্য্যে নিয়তই চূর্ণীভূত হইতেছে, ইনি তাহা সকলকেই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন এবং বৃষ্টির জলপ্রবাহ ও সমুদ্রের স্রোতোভিঘাতে যে নিয়তই ভূ-ভাগের ক্ষয় হইতেছে, তাহাও সকলে দেখিলেন; এই সকল প্রত্যক্ষ ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া হটন্ সাহেব প্রচার করিলেন,—আধুনিক যুগে বৃষ্টিপ্রবাহ ও নদীসমুদ্রাদির স্রোত দ্বারা ভূ-ভাগের যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা অবিরাম চলিতে থাকিলে কয়েক সহস্র বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে আর স্থলচিহ্ন থাকিবে না; সমগ্র ভূভাগ সমুদ্রগর্ভে লীন হইয়া যাইবে।

এই সিদ্ধান্ত প্রচারের পর হটন্ সাহেবের মনে হইয়াছিল,যদি প্রকৃতই ভূপৃষ্ঠ ধৌত হইয়া সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে কি সমুদ্রতলস্থ সেই সঞ্চিত মৃত্তিকা ক্রমে স্তরপর্য্যায়ে সজ্জিত হইয়া প্রস্তরে পরিণত হইতে পারে না, এবং সেই প্রস্তরে জলচর জীবের কি কঙ্কাল দৃষ্ট হইবে না ? নানা স্থানের শিলা পরীক্ষা করিয়া হটন্ সাহেব অনেক স্থলেই জলচর জীবের কঙ্কাল দেখিতে পাইলেন। চূর্ণপ্রস্তর ও স্ফটিকশিলা যে, এককালে সমুদ্র-তলে নিমজ্জিত ছিল,তাহাদের স্তরবিন্যাস ও তৎপ্রোথিত জলচরজীবকঙ্কাল স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতে লাগিল। পর্ব্বতশেখরস্থ প্রস্তরে যে, কখন কখন সমুদ্রচর জীবের কঙ্কাল দেখা যায়, অতি প্রাচীন পণ্ডিতেরা তাহা জানিতেন,— এবং ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেন। পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ এই সান্ত্বনাবাক্যে না ভুলিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভূপৃষ্ঠের ভিত্তিগঠন সর্ব্বাগ্রে সমুদ্রতলে হইয়াছিল বলিয়াই যে, পর্ব্বতস্থ শিলায় জলচর জীবের কঙ্কাল দেখা যায়, হটন্ সাহেবের প্রসাদে এই সময়ে সকলে তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ভূ-তত্ত্বসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইলে সাধারণের মনে দুইটি সন্দেহসূচক প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়জাত মৃত্তিকা দ্বারা যদি প্রকৃতই সমুদ্রতলে নূতন স্থলভাগের ভিত্তি গঠিত হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সমুদ্রতলের কোমল কর্দ্দম কি প্রকারে কঠিন শিলায় পরিণত হইল, এবং সমুদ্রতলশায়ী সেই নূতন ভূভাগই বা কি প্রকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল ? আবিষ্কারক হটন্ ঐ দুইটি বিষয়ের সুমীমাংসার জন্য কিছুদিন পরীক্ষাদি করিয়াছিলেন ; এবং অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার গবেষণা সার্থক হইয়াছিল। প্রস্তরমাত্রেই স্তরবিন্যাস দেখা যায় না ; স্তরহীন শিলা পরীক্ষা করিলে কখন কখন তাহাতে একপ্রকার জমাট পাথর দেখা যায়।

এই পাথরগুলি যে, কোন সময়ে দ্রব অবস্থায় থাকিয়া পরে শীতল হইয়া জমাট বাঁধিয়াছে, উহাদের আকার দেখিলেই তাহা বেশ অনুমান হয়। সর্ব্বপ্রথমে এই শ্রেণীর শিলাগুলি হটন্ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং ভূ-মধ্যস্থ তাপই যে, সমুদ্রতলসঞ্চিত মৃত্তিকাকে গলাইয়া ঐ জমাট শিলার উৎপত্তি করিয়াছে, সে সম্বন্ধে আর তাঁহার সন্দেহ ছিল না। স্তরবদ্ধ প্রস্তরও যে, ভূগর্ভস্থ তাপের কার্য্য, তাহাও তিনি মার্ব্বেল প্রস্তর পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। স্ফটিক-শিলা রাসায়নিক পরীক্ষায় দগ্ধ চূর্ণ-প্রস্তর বলিয়া ধরা পড়িয়াছিল। কাজেই ভূ-গর্ভস্থ তাপই যে, স্তরবদ্ধ শিলারও উৎপত্তির কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না।

ভূ-গর্ভস্থ তাপ দ্বারা কর্দ্দমকে শিলায় পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াই হটন্ সাহেব ক্ষান্ত হন নাই, তৎপরে অল্পদিন মধ্যে আরও অনেক অদ্ভুত কার্য্য তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রতল শায়ী শিলার উত্থান ও পর্ব্বতে পরিণতি ব্যাপারেও তিনি ভূ-জঠরাগ্নির কার্য্য দেখিয়াছিলেন। পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই জানেন, ভূ-কম্পন জগতের প্রায় একটা নিত্য ব্যাপার। ইহার দ্বারা নিয়তই পৃথিবীর কোন স্থান উচ্চ বা কোন স্থাননীচু হইয়া যাইতেছে। হটন্ সাহেব ভূ-কম্পনের এই কার্য্য পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন,—সমুদ্রতলে শত শত বৎসর ধরিয়া ভবিষ্য স্থলভাগে যে ভিত্তি গঠিত হয়, ভূ-গর্ভস্থ তাপজাত ভূ-কম্পনই তাহাকে সাগরগর্ভ হইতে উঠাইয়া মহাদেশে পরিণত করে। প্রাচীনকালে ভূ-গর্ভে তাপ অত্যন্ত অধিক ছিল; কাজেই সেই সময়ে ভূমি প্রবলবেগে কম্পিত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠের আকার প্রায়ই রূপান্তরিত করিত। হিমালয় আল্‌পস্ প্রভৃতি পর্ব্বতমালা এবং এশিয়া য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশ সেই জগৎ ব্যাপী কোন না কোন মহা ভূ-কম্পনের ফল।

হটন্ সাহেব অতি অল্পবয়সে পূর্ব্বোক্ত মহাবিষ্কারগুলি সম্পূর্ণ করেন। ১৭৮১ অব্দে এডিনবরা রয়াল্ সোসাইটির এক অধিবেশনে উক্ত আবিষ্কার-বিবরণী পঠিত হইলে, বিজ্ঞ সভ্যগণ একটু তির্য্যক দৃষ্টিতে যুবক-আবিষ্কারকের প্রতি তাকাইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন মাত্র, বিষয়টা যে রয়াল্ সোসাইটির আলোচ্য হইতে পারে, তাহা ইঁহাদের মনেই হয় নাই; ভূ-তত্ত্বের কথা উঠিলেই তখনও পণ্ডিতগণ সেই ধূমকেতুকে টানিয়া আনিয়া সকলপ্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অবিরাম গবেষণা করিয়া স্বীয় ব্যয়ে আবিষ্কার-বিবরণী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে, হটন্ সাহেব পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

পুরাতনের প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধা সকল দেশেই সমান। সযত্নপোষিত অতি-প্রাচীন ভূ-তত্ত্ববাদগুলির মূলে অজ্ঞাতনামা হটন্ কুঠারাঘাত করিতেছেন দেখিয়া, তাৎকালিক বৈজ্ঞানিকমাত্রই ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। জর্ম্মাণিতে ডাক্তার ওয়ারনার্ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক দল বাঁধিয়া হটনের উপর গালিবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং অনাবিষ্কৃত তথ্যের ভ্রমপ্রদর্শনের জন্য বৃথা চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত সাধারণলোক অবাক্ হইয়া এই বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিতেন; অতি-প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলিকে হঠাৎ ত্যাগ করিয়া, নূতনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে ইঁহারা তখনও সাহসী হন নাই।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিদ্বন্দ্বিগণের আক্রোশ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। নূতন সিদ্ধান্ত-অনুসারে পৃথিবীর বয়ঃকাল বাইবেলোক্ত ছয় হাজার বৎসরেরও অধিক হইতে দেখিয়া, ইঁহারা অবশেষে আবিষ্কারক হটন্ সাহেবকে স্বধর্ম্মত্যাগী অখৃষ্টান্ নাস্তিক প্রভৃতি উপাধি প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর বয়স যে ছয় হাজার বৎসরের অধিক, এবং কালেরও যে সীমা নাই, এই বাইবেলবিরুদ্ধ

কথাগুলি প্রবীণ পণ্ডিতগণকে বুঝাইতে অনেক সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।

পণ্ডিতবর স্মিথ্ ও আচার্য্য কুভেয়ার্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ হটনের আবিষ্কারপ্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের কার্য্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বিষয়ভূত বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করা হইল না। আমরা পরপ্রবন্ধে আধুনিক ভূ-তত্ত্বের আলোচনা কালে, ঐ সকল বিজ্ঞানরথীদিগের কার্য্য বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

আধুনিক ভূ-তত্ত্ব

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুবিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ জেমস্ হটন্ যখন ভূপৃষ্ঠের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে প্রাচীন মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বলিলেন, —ভূগর্ভস্থ তাপই জলস্থলাদির বৈচিত্র্য-বিধানের একমাত্র কারণ, তখন দেশবিদেশের বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই একবাক্যে হটন্ সাহেবকে ধর্ম্ম-বিরোধী নাস্তিক দাম্ভিক প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করিতে লাগিলেন। বৃষ্টি-বাত্যাদি দ্বারা ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকা যে নিয়তই সাগরতলে সঞ্চিত হইতেছে, এবং ভূমধ্যস্থ তাপজাত ভূকম্পন দ্বারা যে সেগুলিই আবার স্থলে পরিণত হইতেছে, হটন্ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ওয়ার্‌নার্ (Werner) এই নূতন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিবার জন্য যে এক দল গঠন করিয়াছিলেন, ছোট-বড় বৈজ্ঞানিকমাত্রেই সেই দলে যোগ দিয়া হটনকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ওয়ার্‌নারের দল বলিতেন,—সৃষ্টির প্রথমে সমগ্র পৃথিবী উত্তপ্ত জলে আবৃত ছিল এবং পাহাড়-পর্ব্বত দেশ-মহাদেশের উপাদান সেই ধরাব্যাপী মহাসাগরেই মিশ্রিত ছিল। ত'ার পরে জল ক্রমে শীতল হইতে আরম্ভ করিলে, মিশ্রিত মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া ভূভাগের রচনা করিয়াছে। পর্ব্বতের উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইঁহারা বলিতেন,—চিনির রস শীতল হইলে যেমন তাহাতে স্বতঃই কতকগুলি দানা জন্মায়, মহাসমুদ্র শীতল হইতে আরম্ভ করিলে সেই প্রকার কতকগুলি শিলাময় বৃহৎ দানার উৎপত্তি হইয়াছিল ; এবং সেই দানাই তখন পাহাড়, পর্ব্বত ও শিলারূপে আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

অগ্নিবাদী (Plutonist) হটন্ ও বরুণবাদী (Neptunist) ওয়ার্‌নারের শিষ্যগণের মধ্যে ভূ-তত্ত্বপ্রসঙ্গে প্রায় পচিশ বৎসর ধরিয়া বাগ্‌যুদ্ধ চলিয়াছিল,—সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া উভয়

দলেরই পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু বাক্যব্যয়ে মূল প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই, শেষে নীহারিকাবাদে লোকের বিশ্বাস হওয়ায় হটনের সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠালাভ করিবার কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে গর্ত্ত খনন করিয়া কেন্দ্রাভিমুখে গেলে যে, গভীরতা অনুসারে তাপ বাড়িতে থাকে, ইতিপূর্ব্বে তাহা জানা ছিল না, নচেৎ এতটা গোলযোগ হইত না। ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ভূগর্ভস্থ তাপের পূর্ব্বোক্ত প্রমাণটি অযাচিত ভাবে হটনের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অগ্নিবাদিগণ এই তথ্যটিকে ও আগ্নেয় পর্ব্বতের কার্য্যকে, তাঁহাদের মতবাদের প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করিলেন,—আমাদের পৃথিবী সর্ব্বপ্রথমে অত্যুষ্ণ দ্রব্যপদার্থময় মহা-পিণ্ডাকারে ছিল, পরে উহার উপরিভাগটা ক্রমে শীতল হইয়া জমাট বাঁধিয়া যাওয়ায়, এই জলস্থলের বিকাশ হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে গহ্বর করিয়া কেন্দ্রাভিমুখে নামিতে থাক, সেই অত্যুষ্ণ দ্রবপদার্থের সাক্ষাৎ পাইবে। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চার্ল্‌স লয়েল্ (Lyell) এই সময় বৈজ্ঞানিক-মহলে খুব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ইনিও হটনের মতবাদ অনুমোদন করিয়া বলিয়াছিলেন,—ভূগর্ভ যে তাপময়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তবে ইহা যে আকেন্দ্র কেবল দ্রবধাতুতে পূর্ণ, এ-কথা বলা যায় না; ভূগর্ভের স্থানে স্থানে গলিত পদার্থময় হ্রদ থাকাই সম্ভব লয়েলের পর আর একদল পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—সৃষ্টির প্রারম্ভে ভূগোলকের দ্রব অবস্থায় থাকা সম্ভবপর বটে, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের উৎপত্তির পর মৃত্তিকার প্রবল চাপে তাহা আর গলিত অবস্থায় থাকিতে পারে না। সম্ভবতঃ এখন সেই দ্রবপদার্থ ভূ-জঠরে লৌহের ন্যায় কঠিন হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার তাপ পূর্ব্ববৎই আছে।

খুঁটিনাটি ব্যাপারে যিনি যাহাই বলুন, জলস্থলের বৈচিত্র্য ও পাহাড়-পর্ব্বতের উৎপত্তি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার যে, ভূ-গর্ভস্থ তাপেরই

কার্য্য, তাহাতে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না। কেবল সুবিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ পূর্ব্বোক্ত লয়েল্ সাহেব অগ্নিবাদীদিগের কয়েকটি উক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভূ-পৃষ্ঠের উৎপত্তি ব্যাপারে যে, ভূগর্ভতাপ নিহিত আছে. ইনিও তাহা বুঝিয়াছিলেন, তবে হটন্ ও তাঁহার শিষ্যগণ এক এক বিশেষ যুগে ক্ষণকালব্যাপী ভূ-কম্পন দ্বারা যে, জলস্থলের বিকাশ কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে লয়েলের ঘোর আপত্তি হইল। ইঁহার মতে, ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন আজ যেমন হইতেছে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও অবিকল সেই প্রকারে হইয়াছিল।

লয়েল্ স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন, মনুষ্যসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত পর্ব্বত ও জলস্থলের উৎপত্তি, ধ্বংস অবিকল একই ভাবে চলিতেছে; বৃহৎ পর্ব্বতগুলির উৎপত্তি-তত্ত্ব নির্দ্দেশ জন্য আকস্মিক প্রবল ভূকম্পের কল্পনার আবশ্যকতা নাই। আমরা আজকাল যে মৃদু ভূকম্পনাদি প্রাকৃতিক উৎপাত প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি, হিমালয় ও আল্পসের মত পর্ব্বতের উৎপত্তির পক্ষে তাহাই প্রচুর— দুই দিনের ভূকম্পের পরিবর্ত্তন আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না সত্য, কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসরের মৃদু ভূকম্পের ফলে হিমালয়ের ন্যায় পর্ব্বতের উৎপত্তি অসম্ভব নয়।

হটন্ সাহেবের কল্পিত সেই প্রাগৈতিহাসিক ভূ-কম্পের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও, কেবল মৃদু ভূ-সঞ্চালন দ্বারা আমাদের সম্মুখেই আজ-কাল যে সকল প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তন হইতেছে, লয়েল্ সাহেব সেগুলিও দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বৃহৎ ভূ-কম্পন ব্যতীত সুইডেন উপকূলের ক্রমোত্থান এবং গ্রীন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতির ক্রমাবনতি প্রত্যক্ষ করিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকগণ ভূপৃষ্ঠকে স্থির ও অচঞ্চল মনে করিয়া যে ভ্রম করিয়া আসিতেছিলেন, হটন্

সাহেবের অনুসন্ধান-ফলে ও লয়েলের চেষ্টায় তাহা অপনোদিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূতত্ত্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। মৃত্তিকা ও শিলাময় কঠিন ভূপৃষ্ঠ এবং তরঙ্গিত সমুদ্র উভয়কেই বৈজ্ঞানিকগণ সচঞ্চল দেখিতে লাগিলেন। পার্থক্যের মধ্যে এই দেখা গেল যে, তরল সমুদ্রজলের উত্থানপতন যেমন প্রতিমুহূর্ত্তেই দৃষ্ট হয়, ভূপৃষ্ঠের বিক্ষোভ সে প্রকারে অল্প সময়ে দেখা যায় না, ইহার এক একটি তবঙ্গের উত্থানপতনে হয় ত সহস্র বৎসর কাটিয়া যায়।

এই সকল সিদ্ধান্তের পর একটা সামান্য ব্যাপার ভূ-তত্ত্বসম্বন্ধীয় একটি অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারের সূচনা করিয়াছিল। উত্তর প্রদেশে অনেক সমতল স্থানে যে বৃহৎ বৃহৎ গোলাকার প্রস্তরখণ্ড প্রায়ই ভূপ্রোথিত দেখা যায় প্রাচীন আধুনিক পণ্ডিতগণ অনেক অনুসন্ধানেও তাহাদের উৎপত্তির প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট সেই পাষাণস্তূপগুলি এক একটি প্রকাণ্ড রহস্যময় ব্যাপাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরের মৃত্তিকাবহুল স্থানেও কয়েকজন ভূতত্ত্ববিদ্ কর্ত্তৃক ঐ প্রকার শিলাখণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ায়, বিষয়টা আরো জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া পণ্ডিতদিগের শরণাপন্ন হইলে, তাঁহারা বাইবেল্ খুলিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শিলাখণ্ড-গুলিকে মহাপ্লাবনের পরিচায়ক বলিয়া স্থির করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, সেই প্রবল বন্যায় যখন সমগ্র সৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন তুচ্ছ শিলাখণ্ড যে তরঙ্গাভিঘাতে নানাস্থানে চালিত হইতে থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! বাইবেলে লিখিত আছে, অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরও বন্যার গ্রাস হইতে অব্যাহতি পায় নাই সুতরাং স্রোতে শিলাখণ্ডগুলির পর্ব্বতশিখরে আশ্রয় গ্রহণ করাই সম্ভব।

কোন আকস্মিক দৈবী ঘটনায় ভূভাগের যে কোন প্রকার স্থায়ী পরিবর্ত্তন হইতে পারে, লয়েল্ সাহেব তাহা মোটেই বিশ্বাস করিতেন না। ধার্ম্মিক বৈজ্ঞানিকদিগের শত বিদ্রূপ সহ্য করিয়া ইনি শিলাসঞ্চালনের কারণান্তর অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া তাঁহাকে অধিকদিন পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় নাই। মেরুপ্রদেশের ভাসমান বরফস্তূপে প্রোথিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড-গুলিকে শত শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে নীত হইতে দেখিয়া, পূর্ব্বোক্ত শিলাখণ্ডগুলিও যে প্রাচীনকালে বরফস্তূপ দ্বারা বাহিত হইয়া চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আর সন্দেহ ছিল না। লয়েলের এই সূক্ষ্মদর্শন ও আবিষ্কারকুশলতায় সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন।

মানুষ যখন খুব নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে, নিরাপদ দিক হইতে অনেক সময়ে উদ্বেগের উদয় হয়। লয়েল্ ও তাঁহার শিষ্যগণ যখন নবাবিষ্কারের জয়োল্লাসে মত্ত, পেরাণ্ডিন্ (Perrandin) নামক জনৈক অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তি ইঁহাদের প্রিয় সিদ্ধান্তটির মূলোচ্ছেদের আয়োজন করিয়াছিলেন। লয়েলের আবিষ্কারসম্বন্ধীয় কোন কথাই এই লোকটি জানিতেন না, তুষারময় উত্তরপ্রদেশে হরিণাদি শিকার করা তাঁহার একমাত্র ব্যবসায় ছিল। পূর্ব্বোক্ত মৃৎপ্রোথিত শিলাস্তূপগুলি হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল ; বাইবেলের জলপ্লাবনের কথা তিনি জানিতেন, কিন্তু বন্যাস্রোতে শিলাস্তূপ কাষ্ঠফলকের ন্যায় ভাসমান হইয়া যে, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, একথা তাঁহার মনে উদয় হয় হয় নাই। সহসা উত্তরপ্রদেশস্থ শত শত বৃহৎ তুষার নদীর (Glaciers) কার্য্য তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এই সকল নদীর তুষার যদি ছোট ছোট শিলাখণ্ড বহন করিয়া চক্ষুর সম্মুখেই চারিদিকে ছড়ায়, তবে সেই বৃহৎ শিলাগুলির বিক্ষেপ প্রাচীনকালের বৃহৎ তুষার-নদী দ্বারা কেন . সম্পন্ন হইবে না ? স্বদেশ-

প্রত্যাগত হইয়া দরিদ্র শিকারী পেরাণ্ডিন্ তাঁহার স্থূল পর্য্যবেক্ষণলব্ধ এই বিশ্বাসের কথা কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন লয়েলের নব-সিদ্ধান্তের মোহে অবিষ্ট থাকিয়া অবৈজ্ঞানিক শিকারীর কথায় কেহই কর্ণপাত করিবার অবকাশ পান নাই। দশ বৎসর পরে ভেনেজ্ (Venetz) নামক জৈনক ফরাসী বৈজ্ঞানিক পেরাণ্ডিনের অনুমানের কথা শুনিয়া একটি বৈজ্ঞানিক সভায় বিষয়টির আলোচনা উত্থাপন করিলে বৈজ্ঞানিকগণের চক্ষু খুলিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ আগাসিজ্ (Agassiz) এবং সারপেন্টিয়ার (Charpentier) নূতন মতবাদটিকে লয়েলের তুষারস্তূপ (Ice-berg) সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। শিকারী পেরাণ্ডিনের উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্ম কিছুদিন আল্পস্ দেশে পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৫৭ আব্দে আগাসিজ্ প্রচার করিলেন,—অতি-প্রাচীনকালে পৃথিবীর উত্তর অংশস্থ সমতল পার্ব্বতীয় ভূমিমাত্রই বরফ দ্বারা আবৃত ছিল। শিলাসঞ্চালন সেই তুষারযুগেরই কার্য্য।

এই সার্ব্বভৌম তুষারযুগের কথা প্রচার করায় আবিষ্কারক আগাসিজ্‌কে প্রথমে কিছুনির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। লয়েলের ন্যায় সুধীগণও আবিষ্কারককে গালিবর্ষণ করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু আগাসিজ্ যখন তুষারযুগের প্রত্যক্ষ লক্ষণ সকল দেখাইতে লাগিলেন, তখন আর কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই। সেই অবধি একটা তুষারযুগের অস্তিত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এই তুষারযুগোৎপত্তির কারণ কি, এবং তাহার প্রসারই বা কতদূর ছিল, এ সকল বিষয়ে আজও বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

ইহার পর ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ স্তরবিন্যাসের পর্য্যায় ও স্তরোৎপত্তি-কাল লইয়া কিছু দিন খুব আন্দোলন করিয়াছিলেন। মর্‌চিসন্, সেজ্‌উইক্ হোয়াইট্‌ফিল্ড প্রমুখ নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ এই আন্দোলনে যোগ

দিয়াছিলেন। ভূ-বিদ্যার এই সময়কার ইতিহাসের অধিকাংশই নীরস বাগাড়ম্বরপূর্ণ হইলেও পণ্ডিতগণের আলোচনায় আমরা স্তরপর্য্যায় নির্দ্দেশের এক নির্দ্দিষ্ট উপায় জানিতে পারিয়াছি এবং তদ্দ্বারা যে কোন শিলাস্তরের বয়ঃক্রম নির্ণয়ও কতকটা সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে হটন্ সাহেব ভূ-পৃষ্ঠের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে যে, মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং সুপণ্ডিত লয়েল্ তাহার যে সংশোধন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি বৈজ্ঞানিক মহলে তাহা অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতেছে। অবৈজ্ঞানিক পেরাণ্ডিনের আবিষ্কার ফলে আগাসিজ্ যে সার্ব্বভৌম তুষারযুগের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাও অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তবে হটন্ পর্ব্বতমাত্রেরই উত্থানে যে আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন এবং লয়েল যে ঐ আকস্মিক উৎপাতের সম্পূর্ণ অভাবের কথা বলিয়া গিয়াছেন, আধুনিক নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিকগণ এই দুই চরম মতের মধ্যে কোনটিই গ্রাহ্য করিতেছেন না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অগ্রণী লর্ড কেল্ভিন বলিয়াছিলেন, জীবশরীরের পরিবর্ত্তন যেমন শৈশবেই অধিক দেখা যায়, সম্ভবতঃ পৃথিবীরও শৈশবজীবনে সেই প্রকার একটা পরিবর্ত্তনস্রোত প্রবলভাবে চলিয়াছিল, এবং বৃদ্ধ জীবের শারীরিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া শৈশবের পরিবর্ত্তন পরিমাপ করা যেমন কঠিন, আধুনিক পৃথিবীর পরিবর্ত্তন দেখিয়া পূর্ব্বেকার পৃথিবীর পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করা সেই প্রকার অসম্ভব।

অতি-প্রাচীনকালে পৃথিবী যে, কোমল বা তরল অবস্থায় ছিল, তাহাতে আর এখন কোন মতদ্বৈধ নাই। তদ্ব্যতীত তাপক্ষয়ে দ্রব পৃথিবীর উপরিভাগটা নাতিস্থূল কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে, চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণ ও আভ্যন্তরীণ তাপাদিতে যে, সেই কঠিন আবরণের প্রায়ই পরিবর্ত্তন হইত, তাহাও বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিয়াছেন। শিশু পৃথিবীর আকাশের কথা ভাবিলে আমরা ভূপৃষ্ঠের পরিবর্ত্তনের আরো একটা

কারণ দেখিতে পাই। বর্ত্তমানকালে আকাশে যেমন বিশুদ্ধ অক্সিজেন্ নাইট্রোজেন ও কিঞ্চিৎ কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্পের মিশ্রণ দেখা যায়, শিশু পৃথিবীর আকাশে অবশ্যই তাহা ছিল না। তখন অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি বাষ্প বাতাসে প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত থাকিত, কাজেই তখন সেই সকল রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা ভূপৃষ্ঠের আশু ক্ষয় হওয়াই সম্ভব ছিল, এবং তাহার ফলে পৃথিবী প্রায়ই নূতন আকার ধারণ করিত। এখন বয়োবৃদ্ধির সহিত পৃথিবীর আকাশস্থ সেই হাইড্রোজেন, অঙ্গারাদি বাষ্প ক্রমে মার্বেল. গ্রানাইট. চূর্ণ, প্রস্তর, পাথুরিয়া কয়লা ইত্যাদি আকারে ভূ-গর্ভে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই এখন আর সেই ত্বরিত পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্ত্তনের বিরাম নাই। আজ পৃথিবীকে যেমনটি দেখিতেছি, কাল বা শত বৎসর পরে তাহাকে আর তেমন দেখিব না। তবে কি ধরার এই পরিবর্ত্তন চিরকালই এই প্রকারে চলিবে? বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট প্রশ্নটির একটা বড় অশুভ উত্তর পাওয়া যায়। ইঁহারা বলেন, তাপবিকিরণ দ্বারা ভূগর্ভ যখন ক্রমেই শীতলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন দূর ভবিষ্যতে এমন একটা সময় আসিবে, যখন ভূজঠরাগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া ভূকম্পনাদি উৎপন্ন করিতে পারিবে না, ভূসঞ্চালনের অভাবে বৃষ্টিবাত্যাদি ভূপৃষ্ঠকে স্থায়িরূপে ক্ষয় করিবার সুযোগ পাইয়া যাইবে। সুতরাং এখন সমুদ্র যেমন সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, তখন তাহার সে সীমা থাকিবে না এবং সমস্ত ভূভাগ গিরিশৈল উদরস্থ করিয়া সপ্তসিন্ধু এক মহাসিন্ধুতে পরিণত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে ঘেরিয়া ফেলিবে। এই সর্ব্বগ্রাসী প্রলয় আর কতদিন পরে যে পৃথিবীকে আক্রমণ করিবে, তাহা গণনায় ঠিক ধরা পড়ে না।

ভূ-গর্ভ

ভূপৃষ্ঠের বারো আনা সমুদ্রজলে নিমজ্জিত। অবশিষ্ট চারি আনার মধ্যে দুইটা বৃহৎ অংশ চিরতুষারে আচ্ছন্ন। কাজেই, তাহা মানুষের দুরধিগম্য। তা'ছাড়া আবার মরুভূমি এবং মহারণ্য ভূপৃষ্ঠের অনেকটা গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং হিসাব করিলে দেখা যায়, এই বৃহৎ পৃথিবীর অতি অল্প অংশই মানুষের আয়ত্তে রহিয়াছে।

এই ত গেল পৃথিবীর উপরকার কথা। ভিতরকার খবর কতটা জানা আছে, আলোচনা করিতে গেলে, আমাদের জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা আরো সুস্পষ্ট বুঝা যায়। সাধারণতঃ যে সকল খনি খুব গভীর বলিয়া পরিচিত, তাহাদের কাহারো গভীরতা তিন হাজার তিন শত ফিটের অধিক নয়। সম্প্রতি সাত হাজার তিন শত পঞ্চাশ ফুট গভীর একটি খনির কথা শুনা গিয়াছে। একথা সত্য হইলে বলিতে হয়, ভূপৃষ্ঠের দেড়মাইল নীচেকার খবর আমরা প্রত্যক্ষ জানিতে পারিয়াছি। ভূপৃষ্ঠ হইতে পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলের দূরত্ব প্রায় চারিহাজার মাইল। সুতরাং চারিহাজার মাইলের মধ্যে কেবল দেড় মাইলের জ্ঞান যে কিছুই নয়, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

আলোকে ঝাঁপ দিয়া পড়া জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। অন্ধকারে আলোকপাত করিয়া ভিতরের খবর জানার প্রবৃত্তিই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। অন্ধকারের এই মোহই আজ মানুষকে বিদ্যা ও জ্ঞানে এত উন্নত করিয়াছে। আবার সৃষ্টিতত্ত্বটাও এমন রহস্যময় যে, এক অন্ধকারের আবরণ উন্মোচিত হইতে না হইতে আর একটা নিবিড়তর অন্ধকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। এই লীলার শেষ কোথায়, তাহা কেহই বলিতে

পারে না। যাহা হউক ভূ-গর্ভের অন্ধকারে আলোকপাত করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, আলোচনা করা যাউক।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ যে সকল শিলামৃত্তিকা দিয়া গঠিত; তাহাদের গুরুত্ব সকল স্থানে সমান নয়। ভূগর্ভে লঘুগুরু নানাজাতীয় শিলামৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের সমবেত গুরুত্বের একটা হিসাব খাড়া করিলে, তাহা জল অপেক্ষা দুইগুণের অধিক ভারী হয় না। অথচ সমগ্র পৃথিবীটার গুরুত্ব জল অপেক্ষা প্রায় সাড়ে পাঁচগুণ অধিক। ভূ-গর্ভের অবস্থাসম্বন্ধে যাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারটা সর্ব্বপ্রথমে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত যতপ্রকার শিলা ভূ-গর্ভে দেখা গিয়াছে, তাহাদের কোনটিরই গুরুত্ব জল অপেক্ষা সাড়ে তিন গুণের অধিক হয় নাই। সুতরাং বলিতে হয়, অমরা ভূ-গর্ভের যে দেড় মাইলের সহিত পরিচিত আছি, তাহার নিম্নপ্রদেশ নিশ্চয়ই কোনপ্রকার অতিগুরু পদার্থে পূর্ণ রহিয়াছে; নচেৎ সমগ্র পৃথিবীর গুরুত্ব কখনই জল অপেক্ষা সাড়ে পাঁচগুণ হইতে পারে না। অনেকে বলেন, সাধারণ শিলাই উপরকার মাটীর চাপে খুব সঙ্কুচিত হইয়া ভারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে নানাকারণে এখন ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ এই কথাটির সত্যতায় সন্দিহান হইয়া ভূ-গর্ভের গভীর অংশ ধাতুর দ্বারা পূর্ণ অনুমান করিতেছেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই অনুমানের যুক্তি কোথায়? ভূতত্ত্ববিদ্‌-গণের যুক্তি বুঝিতে হইলে সৌরজগতের সৃষ্টির কথা স্মরণ করা আবশ্যক হইবে। একটা বিশাল জলন্ত নীহারিকা-স্তূপই যে, কালক্রমে জমাট বাঁধিয়া এই গ্রহ-উপগ্রহময় সৌরজগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। কাজেই, চন্দ্রসূর্য্য শুক্রশনি এখন পৃথক্ হইয়া অবস্থান করিলেও সৃষ্টির আরম্ভে তাহারা যে একই ছিল এবং তাহাদের অস্থিমজ্জা যে, মূলে একই উপাদানে গঠিত হইয়াছিল, তাহা মানিয়া

লইতে হয়। যে ভূমি আশ্রয় করিয়া আমরা দিবারাত্রি অবস্থান করিতেছি, তাহারা গভীরতম প্রদেশের খবর পাইয়া, পৃথিবীরই যে সকল সহোদর-জ্যোতিষ্ক আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে ধরার খবর জানিবার চেষ্টা হইয়াছিল। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের ভ্রমণপথে মধ্যবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রহ (Asteroids) দেখা যায়। বহুদূরে থাকিয়াও আমরা ইতিমধ্যে এই শ্রেণীর প্রায় আড়াইশত গ্রহের সহিত পরিচিত হইয়াছি। এখনো প্রতি বৎসরেই দুইচারিটি করিয়া নূতন ক্ষুদ্র গ্রহের আবিষ্কার হইতেছে। মহাকাশের এই সঙ্কীর্ণস্থানে এতগুলি ছোট ছোট জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব দেখিয়া জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন, এককালে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে নিশ্চয়ই একটি বড় গ্রহ ছিল এবং সেইটি কোন কারণে ভাঙ্গিয়া গিয়া এই সকল ক্ষুদ্রগ্রহের উৎপত্তি করিয়াছে। ইহাদিগের আকারের বিচিত্রতা লক্ষ্য করিলে জ্যোতিষিগণের এই সিদ্ধান্তের সত্যতা আরো ভাল করিয়া বুঝা যায়। ক্ষুদ্র গ্রহগুলির মধ্যে কোনটারই আকার পৃথিবী, মঙ্গল বা বৃহস্পতি প্রভৃতি বড় গ্রহের ন্যায় গোল নয়। কোন জিনিষকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সেইটির খণ্ডিত অংশগুলি যেমন বিচিত্র আকার গ্রহণ করে, ক্ষুদ্র গ্রহ-গুলির আকারে ঠিক সেই প্রকার বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছে। সুতরাং আকৃতি দেখিয়া এখন ইহাদের পূর্ব্ব-ইতিহাস কতক পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতেছে। যাহাহউক, এই ক্ষুদ্র গ্রহগুলি কেবল মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার মধ্যে অবস্থান করে না। কখনো কখনো কতকগুলি, মঙ্গলের কক্ষা ভেদ করিয়া পৃথিবীর আকর্ষণের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় তাহারা আর আকাশে পরিভ্রমণ করিতে পারে না, পৃথিবীর টানে তাহাদিগকে ভূতলে আসিয়া পড়িতে হয়। আমরা মাঝে মাঝে যে বড় বড় উল্কার (Meteorite) পতন দেখি, তাহা সেই মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী গ্রহের ভগ্নবিশেষেরই পতন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এই জ্যোতিষিক তত্ত্বটি প্রচারিত হইলে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যে সকল বৃহৎ উল্কাপিণ্ড বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া পুড়িতে পুড়িতে ভূতলে আসিয়া পতিত হয়, তাহাদিগের দগ্ধাবশেষ পরীক্ষা করিলে ভূ-গর্ভের নানা অংশে কি পদার্থ আছে, তাহা স্থির করা যাইতে পারিবে। যখন সৌর-জগতের সকল জ্যোতিষ্কই এক উপদানে গঠিত, তখন উল্কাপিণ্ডের উপাদান ও ভূ-গর্ভস্থ পদার্থ একই হইবার কথা।

যাহা হউক, পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। পৃথিবীর নানা স্থানে এ পর্য্যন্ত যে সকল উল্কাপিণ্ড পতিত হইয়াছে, তাহাদের ক্ষুদ্র অংশ সংগ্রহ করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ রাসায়নিক পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে সুস্পষ্ট তিন জাতীয় উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব ধরা পড়িয়াছিল। যে-গুলি অত্যন্ত গুরু, তাহাতে লৌহেরই আধিক্য দেখা গিয়াছিল, তা'ছাড়া নিকেল্ ক্রোমিয়ম্ প্লাটিনম্, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুর চিহ্নও প্রকাশ পাইয়াছিল। মাঝারি গুরুত্বের উল্কাপিণ্ডে পূর্ব্বের অনুরূপ লৌহের আধিক্য দেখা যায় নাই; লৌহের সহিত নিকেল ও বালুকা মিশিয়া জিনিষটার ভার লঘু করিতেছে বুঝা গিয়াছিল। লঘুতম উল্কাপিণ্ডে আমাদের ভূ-গর্ভস্থ শিলারই অনুরূপ উপাদান ধরা পড়িয়াছিল। ভূ-গর্ভের গুরু প্রস্তরগুলিতে যেমন বালুকা, ম্যাগ্‌নেসিয়ম্ এবং লৌহ ও নিকেলের এক একটু চিহ্ন দেখা যায়, এই শিলাময় লঘু উল্কাপিণ্ডে অবিকল তাহাই দেখা গিয়াছিল। এই তিন শ্রেণীর উল্কাপিণ্ডকে মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার মধ্যস্থ সেই বিখণ্ডিত জ্যোতিষ্কটির বিভিন্ন অংশের উপাদান বলিয়া স্থির করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন, আমাদের পৃথিবীর ভিতরে ধাতু, শিলা ও মৃত্তিকার তিনটি পৃথক্ স্তর আছে। ধাতুস্তরটি ভূকেন্দ্রকে ঘিরিয়াছে, তাহার উপরে শিলা ও ধাতুর মিশ্রিত স্তর এবং সর্ব্বোপরি আমাদের সুপরিচিত মৃত্তিকা ও শিলা।

ভূ-গর্ভের অতি গভীর স্থানের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তটি কেবল উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করিয়াই স্থির হয় নাই। সম্প্রতি ভূমিকম্পের বেগ পরিমাপ করিয়াও বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ভূ-গর্ভের কোন স্থানে বিশেষ কারণে আন্দোলন উপস্থিত হইলে, জলের ঢেউয়ের মত সেই আন্দোলন-স্রোত বিচিত্র বেগে চারিদিকে ধাবিত হইয়া যখন ভূপৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই আমরা ভূকম্পন অনুভব করি। এই আন্দোলন-স্রোত সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করিবার জন্য আজকাল নানাপ্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে। ইহার সাহায্যে প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, ভূগর্ভের অতি-গভীর অংশে যে আন্দোলন উৎপন্ন হয় তাহা ঋজুভাবে আসিয়া ভূতলে পেঁাছায় না। সূর্য্যালোক যেমন ভিন্ন ভিন্ন বায়ুস্তরের ভিতর দিয়া আসিবার সময় বাঁকিয়া (Refracted) আসিয়া ভূতলে পতিত হয়, ভূকম্পনের তরঙ্গ কতকটা সেই প্রকার পথ অবলম্বন করে। সুতরাং বলিতে হয়, আমাদের পৃথিবীটি কখনই আকেন্দ্র একই পদার্থ দ্বারা গঠিত নয়। কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে নিশ্চয়ই কোন ঘন পদার্থ বর্ত্তমান এবং তাহারি উপরে কয়েকটি লঘুতর পদার্থের স্তর উপর্য্যুপরি সজ্জিত আছে। তরঙ্গের বেগ, বাহক-পদার্থের (Medium) ঘনতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বাতাসের ভিতর দিয়া শব্দতরঙ্গ যে বেগে ধাবিত হয়, জলের ভিতর দিয়া উহাই অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে চলে। আবার লৌহ, শিলা প্রভৃতি কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া সেই তরঙ্গগুলিকে চালাইতে থাকিলে বেগ আরো দ্রুত হইয়া যায়। সুতরাং আন্দোলনের বেগ পরিমাপ করিলে বাহক-পদার্থের ঘনতা অনায়াসেই নির্ণয় করা যাইতে পারে। ভূমিকম্পের বেগ পরীক্ষা করিয়া এই প্রকারে স্থির করা হইয়াছে যে, মৃত্তিকার নিম্নে যে শিলাময় স্তর আছে, তাহার গুরুত্ব জল অপেক্ষা অন্ততঃ সাড়ে তিন গুণ অধিক এবং ইহার নিম্নের ধাতুস্তরের গুরুত্ব জলের প্রায়

আটগুণ। উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছিল, ভূকম্পন পরীক্ষায় অবিকল সেই ফল লাভ করিয়া ভূগর্ভসম্বন্ধে সকল সন্দেহই দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া যে, এক লৌহ-প্রধান ধাতুময় কোষ অবস্থান করিতেছে এবং তাহারি উপরে যে, যথাক্রমে শিলা ও মৃত্তিকাস্তর সজ্জিত আছে, এখন একথা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। ধাতুস্তর ভূপৃষ্ঠ হইতে কত নিম্নে অবস্থিত, তাহারো একটা স্থূল হিসাব খাড়া করা হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন, ভূতল হইতে অন্ততঃ হাজার মাইল নিম্নে না যাইলে ধাতুস্তরের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীকে এখন যে অবস্থায় দেখিতেছি, সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহার সে প্রকার অবস্থা ছিল না। এক বিশাল জলন্ত নীহারিকা-রাশির অতি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিয়া পৃথিবীর এই জল মাটী শিলা প্রভৃতির উপাদান অবস্থান করিতেছিল। জগতের সমস্ত প্রাণী উদ্ভিদ্ চেতন অচেতন বস্তুরও দেহের উপাদান সেই নীহারিকা-রাশির অংশীভূত ছিল। তা'র পর কালক্রমে বিশেষ কারণে উহাই খণ্ডিত হইয়া জমাট্ বাঁধিয়া ক্রমে পৃথিবী শুক্র মঙ্গল চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টি-তত্ত্বের এই কথা মানিলে বলিতে হয়, সূর্য্য এখন যেমন উষ্ণ থাকিয়া তাপালোক বিকিরণ করিতেছে, আমাদের পৃথিবীও এককালে সেইরূপ তাপালোক-বিকিরণক্ষম ছিল; লৌহ প্রভৃতি ধাতু এবং শিলামৃত্তিকার উপাদান সকল তখন অতি উষ্ণ অবস্থায় থাকিয়া জ্বলিত। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠকপাঠিকা অবশ্যই অবগত আছেন, ধাতব পদার্থকে উত্তপ্ত করিয়া গলাইলে সেটি প্রচুর পরিমাণে বায়বীয় পদার্থ শোষণ করিয়া রাখিতে পারে এবং তা'র পরে উহা শীতল হইতে আরম্ভ করিলেই সেই সঞ্চিত বায়ু আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়ে। ধাতু এবং অপর কতকগুলি পদার্থের এই বায়ুশোষণ

শক্তির সাহায্যে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ আজকাল ভূগর্ভসম্বন্ধীয় অনেক প্রহেলিকার মীমাংসা করিতেছেন। আগ্নেয়গিরির উৎপাতের সময় জলীয় বাষ্প, অঙ্গারক বায়ু এবং ক্লোরিন্‌ প্রভৃতি নানা বায়বীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই ব্যাপারের নানাপ্রকার ব্যাখ্যান দিতেন। এখন ইঁহারা একবাক্যে বলিতেছেন, ভূগর্ভের নিম্নস্তরে উষ্ণ ধাতুগুলি যে সকল বায়ু কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তাহাই শীতল ধাতুরাশি হইতে মুক্ত হইয়া ভূগর্ভে সঞ্চিত হইতেছে। আগ্নেয়গিরির সুগভীর সুড়ঙ্গগুলিই ভূগর্ভের সহিত ভূতলের যোগ রাখিয়া দিয়াছে। কাজেই, এই পথ অবলম্বন করিয়াই বহুকালের আবদ্ধ বাষ্প ভূতলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ আগ্নেয় পর্ব্বতগুলিকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত দেখিয়া, পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন, সমুদ্রের জলই চোঁয়াইয়া ভূগর্ভের নিম্নস্তরে গিয়া ঠেকিলে বাষ্প হইয়া পড়ে এবং এই সদ্যোজাত বাষ্পই সবলে উপরের স্তরগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আগ্নেয়-গিরির উৎপত্তি করে। ধাতুস্তরে আবদ্ধ পূর্ব্বোক্ত বাষ্পের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় এই সিদ্ধান্তটি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নবসিদ্ধান্তে আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এখন এত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন যে, পাহাড় পর্ব্বত ও সমুদ্রের উৎপত্তিতেও ইঁহারা সেই আবদ্ধ বাষ্পের কার্য্য দেখিতেছেন। সমুদ্রের উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইঁহারা বলেন, নীহারিকার অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সংযুক্ত হইয়া সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবীতে যে জলীয় বাষ্পের উৎপত্তি করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই উত্তপ্ত ধাতুরাশি শোষণ করিয়া রাখিয়াছিল। তা'র পরে পৃথিবী শীতল হইতে আরম্ভ করিলে উহাই বন্ধনমুক্ত হইয়া এই বৃহৎ সমুদ্রগুলির উৎপত্তি করিয়াছে। এখনো আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে

যে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়, তাহার পরিমাণ অল্প নয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, নানাজাতীয় শিলা ও দানাদার (Crystals) বস্তুর উৎপত্তিতে নিয়তই সমুদ্র-জলের যে ক্ষয় যাইতেছে, আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে মুক্ত জলীয় বাষ্পরাশিই সেই ক্ষয়ের পূরণ করিতেছে।

পৃথিবীর গুরুত্ব

নিক্তি ও গজকাঠি বৈজ্ঞানিকদিগের দুইটি প্রধান যন্ত্র। পৃথিবী যে একটা বর্ত্তুলাকার জিনিষ, অতি-প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহা জানিতেন না। যেদিন পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছিল, আলেকজাণ্ড্রিয়ার জ্যোতিষিগণ সেই দিনই গজকাঠি হাতে করিয়া, পৃথিবীর পরিধি পরিমাপের জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াই নিউটন সাহেব পৃথিবীর গুরুত্ব পরিমাপের জন্য নিক্তি বাহির করিয়াছিলেন। ডাল্‌টন্‌ সাহেব তাঁহার পারমাণব সিদ্ধান্তের আভাস দিলে, তাঁহার শিষ্যবর্গ সিদ্ধান্তের সুপ্রতিষ্ঠার কাল পর্য্যন্তও অপেক্ষা না করিয়া অণুপরমাণুর গুরুত্ব ও আকার-প্রকারাদি স্থির করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এগুলি অবশ্য বিজ্ঞানের পুরাতত্ত্বের কথা। কারণ, বৈজ্ঞানিক-গবেষণার এখনকার ধারা প্রাচীনকালের তুলনায় স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীনেরা প্রকৃতিকে যে-ভাবে দেখিতেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এখন আর তাহাকে সে-ভাবে দেখেন না। এ ভাবটি যাহাই হউক না কেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু প্রাচীনদিগের সেই নিক্তি ও গজকাঠিকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। সার্‌ উইলিয়ম্‌ ক্রুক্‌স্‌ যেদিন তাঁহার পরীক্ষায় "ইলেক্ট্রনের" সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার পরদিবসই এক একটি ইলেক্ট্রনের গুরুত্ব স্থির করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকমহলে ধূম পড়িয়া গিয়াছিল।

প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। তাঁহাদের প্রসাদে গ্রহ-উপগ্রহ এবং অণু-পরমাণু প্রভৃতি অনেক জিনিষের ওজন আমরা জানিতে পারিয়াছি। তা' ছাড়া শব্দ, তাপালোক এবং বিদ্যুতের বেগও স্থির হইয়া গিয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার গুরুত্ব

লইয়া আজ আমরা আলোচনা করিব না। যে গ্রহটি আমাদের অতি আপনার, সেই ধরিত্রীর গুরুত্বের বিষয়ই আমাদের আলোচ্য।

বৃহৎ আয়তনের জিনিষের ভার স্থির করিতে হইলে বড়ই গোলযোগে পড়িতে হয়। জিনিষ ছোট হইলে, নিক্তির এক পাল্লায় তাহা চাপাইয়া এবং অপর পাল্লায় বাটখারা দিয়া সহজে গুরুত্ব নির্ণয় করা চলে। বলা বাহুল্য, বড় জিনিষকে এই ব্যবস্থায় ওজন করা এক প্রকার অসম্ভব। কাজেই, ইঁহাদের ওজন ঠিক করিবার জন্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক। জিনিষ যতই বড় হউক না কেন, তাহার ঘনফল (Cubical Area) স্থির করা কঠিন নয় এবং তাহার এক ঘনফুট ক্ষুদ্র অংশের ওজন কত, তাহাও সাধারণ উপায়ে অনায়াসে স্থির করা যাইতে পারে। এখন এই ওজনকে পদার্থের ঘনফল দিয়া গুণ করিলে, গুণফল যে সেই বৃহৎ বস্তুটিরই গুরুত্ব জ্ঞাপন করিবে, তাহা বুঝা যায়।

পৃথিবীর গুরুত্ব স্থির করিতে গিয়া কয়েকজন পণ্ডিত উপরি-উক্ত প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন। সমগ্র পৃথিবীর ঘনফল কত ঘন-মাইল প্রথমে ঠিক করিয়া, পরে ভূস্তরের এক ঘন-মাইল অংশের গুরুত্ব দ্বারা তাহাকে গুণ করিয়া, ইঁহারা একটা ফল দেখাইয়াছিলেন।

হিসাবটাকে যত সহজ দেখা গেল, কাজে লাগাইতে গেলে তাহাকে সে প্রকার সরল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পৃথিবীর আয়তনটা যে কত, তাহা নির্ভুলরূপে স্থির করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তা' ছাড়া এক ঘন-মাইল ভূস্তরের ভার নিরূপণ আরো কঠিন। পৃথিবীর স্তরগুলি যে, আকেন্দ্র সমঘন (Homogeneous) নহে, পদে পদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ভূপঞ্জরস্থ সামগ্রীর এক ঘন-মাইলের গুরুত্ব গড়ে কত, তাহা স্থির করা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

পৃথিবীর ঘনফল নিরূপণের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত দার্শনিক ইরাটস্‌থেনিস্ (Eratosthenes) তাহা সুকৌশলে গণনা করিয়া লিপিবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেই প্রাচীন গণনায় বিশেষ ভুল দেখিতে পান নাই। কাজেই, গুরুত্ব নির্দ্ধারণের বিশেষ সুবিধা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভূপঞ্জরের গড় গুরুত্ব নির্ণয় অত সহজ হয় নাই। ভূপৃষ্ঠের উপরে যে সকল পাহাড়-পর্ব্বত দেখা যায়, তাহাদের শিলার গুরুত্ব সাধারণতঃ সম-আয়তন জল অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ অধিক। এই হিসাবটাকে দাঁড় করাইতে বিশেষ আয়োজনের আবশ্যক হয় না। কিন্তু ভূগর্ভের গভীর অংশে যে সকল শিলা প্রোথিত আছে, উপর হইতে তাহাদের গুরুত্ব স্থির করা সহজ নয়। অথচ এই গুরুত্ব না জানিতে পারিলে গড় গণনা অসাধ্য হইয়া পড়ে। ভূপৃষ্ঠস্থ শিলার তুলনায় ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদির গুরুত্ব যে অনেক অধিক, তাহা আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। কারণ, উপর্য্যুপরি সজ্জিত বহুস্তরের চাপে নীচের মৃত্তিকার গুরুভারবিশিষ্ট শিলায় পরিণত হইবারই কথা। কাজেই, ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী এক ঘনমাইল মৃত্তিকার গুরুত্ব কখনই ভূগর্ভের দশ মাইল নীচেকার মৃত্তিকার গুরুত্বের সমান হইতে পারে না। ভূপঞ্জরের গড়-গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য উপায়ন্তর অবলম্বন আবশ্যক।

পৃথিবী তাহার পৃষ্ঠস্থ সকল জিনিষকেই কেন্দ্রের দিকে টানে। এই বৈজ্ঞানিক সত্যটির সহিত আমরা আবাল্য পরিচিত। দোলকের (Pendulum) আন্দোলন এবং উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত জিনিষের সবেগে ভূতলে পতন প্রভৃতি অনেক ব্যাপারই এক পৃথিবীর টানেই নিয়মিত। পদার্থের গুরুত্বও ঐ টান ব্যতীত আর কিছুই নয়। কোন

জিনিষকে ওজন করিবার সময় আমরা ঐ টানেরই পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে যাই।

ওজন ঠিক করিবার জন্য সাধারণতঃ নিক্তি বা দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার করা হয়। নিক্তির এক পাল্লায় জিনিষটিকে রাখিয়া, অপর পাল্লায় পরিজ্ঞাত ওজনের কতকগুলি লোহা পাথর চাপান হইয়া থাকে। যে সকল জিনিষের সামগ্রী-পরিমাণ সমান এবং ভূকেন্দ্র হইতে যাহাদের দূরত্বও সমান, তাহাদিগকে পৃথিবী সমান বলে টানে। কাজেই, পাল্লার জিনিষ ও বাট্‌খারাকে সমান বলে টানিয়া পৃথিবীই নিক্তির দণ্ডটিকে চক্ষুর সম্মুখে ঠিক সোজা করিয়া রাখে। আমরা ইহা দেখিয়াই জিনিষের ভার নির্ণয় করি।

এখন মনে করা যাউক, যেন সাধারণ দাঁড়িপাল্লার পরিবর্ত্তে স্প্রিংএর নিক্তি দিয়া কোন জিনিষ ওজন করা যাইতেছে। জিনিষটা নিজের ভারে স্প্রিংটাকে যত টানিয়া লম্বা করে, এই যন্ত্র দ্বারা কেবল তাহাই পরিমাপ করিয়া ওজন ঠিক করা হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, দুইটি জিনিষের সামগ্রী-পরিমাণ (Mass) যদি সমান হয়, এবং ভূকেন্দ্র হইতে তাহাদের দূরত্বও সমান থাকে, তবে পৃথিবী তাহাদিগকে সমান বলে টানে। এই কারণেই পাল্লার ওজনে তাহাদের ভার সমান দেখা যায়। কিন্তু দূরত্বের পরিবর্ত্তন করিলে পৃথিবীর টানের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা দাঁড়িপাল্লায় ধরা পড়ে না। এই পরিবর্ত্তন দেখিতে হইলে স্প্রিংএর নিক্তির সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। এই যন্ত্র দ্বারা কোনও জিনিষকে ভূতলে ওজন করিয়া, যদি তাহাই পরে উচ্চ পর্ব্বতশিখরে রাখিয়া ওজন করা যায়, তবে সেই একই জিনিষের দুই স্থানের ওজনের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। ভূতলের ওজনের তুলনায় পর্ব্বতচূড়ার ওজন অনেক কম হইয়া দাঁড়ায়। ওজনের এই অনৈক্য পরীক্ষা করিয়া পদার্থসকল যে নিয়মে পরস্পরকে টানাটানি

করে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। হিসাবে দেখা গিয়াছে, পদার্থের মধ্যেকার দূরত্ব যে প্রকারে পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহার বর্গের বিলোম-অনুপাতে আকর্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অর্থাৎ দূরত্ব দ্বিগুণ হইলে পরস্পরের টান পূর্ব্বেকার আকর্ষণের চারিভাগের এক ভাগ হইয়া দাঁড়ায়। কেবল পৃথিবীই যে ভূতলস্থ বস্তুগুলিকে একই নিয়মে আকর্ষণ করে তাহা নয়, অতি সূক্ষ্ম বালুকণা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সকল বস্তুই এই নিয়মে শৃঙ্খলিত।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়, আমরা কোন জিনিষকে যখন স্প্রিংএর নিক্তি দিয়া ভূতলে ওজন করি, কেবল পৃথিবীর টান তাহাতে প্রকাশ পায় না। পার্শ্বস্থ ছোট-বড় নানা জিনিষ তাহাদের প্রত্যেকের দূরত্ব ও সামগ্রী-পরিমাণ অনুসারে আকর্ষণ করিয়া জিনিষটাতে যে এক সমবেত টান দেখায়, নিক্তিতে তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়ে। রজ্জুর একপ্রান্তে কোন একটি জিনিষ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে, জিনিষটি পৃথিবীর টানে ভূতলের সহিত লম্বভাবে অবস্থান করে। কিন্তু পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া রজ্জুটিকে নীচে নামাইতে থাকিলে, রজ্জুপ্রান্তস্থ জিনিষটিকে ভূতলের সহিত ঠিক লম্বভাবে নামিতে দেখা যায় না। পর্ব্বতের টানে সেটি পর্ব্বতের দিকে হেলিয়া নামিতে আরম্ভ করে। এডিনবরার নিকটবর্ত্তী এক পাহাড়ের উপর হইতে এই প্রকার পরীক্ষা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার হেনরি জেম্স্ লম্বিত রজ্জুর প্রায় সাড়ে চারি সেকেণ্ড বিচলন লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

দোলকের (Pendulum) আন্দোলনের কারণ বোধ হয় পাঠকের অবিদিত নাই। দোলককে টানিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহার নিজের ভারে (অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণে) সেই লম্বভাবে ঝুলিতে

চায়। কিন্তু উপর হইতে নীচে নামিবার সময় যে ঝোঁক পায়, তাহাতে দোলকটি বিপরীত দিকে খানিকটা উঠিয়া পড়ে, এবং পর মুহূর্ত্তেই আবার নিজের ভারে নীচে নামিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে বহুক্ষণ ধরিয়া দোলকের আন্দোলন অবিরাম চলিতে থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পৃথিবীর আকর্ষণই দোলকের পরিচালক। আকর্ষণের পরিমাণ কমিতে বা বাড়িতে থাকিলে, সঙ্গে সঙ্গে দোলকের আন্দোলনবেগেরও হ্রাসবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যক্ষ পরীক্ষাতেও ঠিক ইহাই দেখা গিয়াছে। বিষুবপ্রদেশের তুলনায় মেরুসন্নিহিত স্থানগুলি ভূকেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী। কাজেই, বিষুবপ্রদেশের তুলনায় উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশের পৃথিবীর টান কিছু অধিক হইবার কথা। একই দোলককে ইংলণ্ড ও বিষুবপ্রদেশে দোলাইয়া দেখা গিয়াছে, যে সময়ে ইংলণ্ডের দোলক ৮৬,৪০০ বার দোলে, বিষুবপ্রদেশে সেই সময়ে সেই একই দোলক ১৩৫ বার অধিক আন্দোলন করে।

ভূগর্ভের গভীর প্রদেশে দোলক লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিলে ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত কারণে আন্দোলন-সংখ্যার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। পৃথিবী যদি সমঘন (Homogeneous) পদার্থ দ্বারা আকেন্দ্র গঠিত হইত, তবে এই পরীক্ষায় আন্দোলন-সংখ্যার হ্রাসই দেখা যাইত। কারণ, তখন কেবল নীচের মৃত্তিকাই দোলকটিকে টানিত, উপরের মৃত্তিকার টান তাহাতে মোটেই কার্য্য করিতে পারিত না। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় ইহার ঠিক বিপরীত ফল দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ডের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত গভীর খনির ভিতর দোলক আন্দোলিত করিয়া আন্দোলন-সংখ্যার বৃদ্ধি সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং এই বিপরীত ফলের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, পৃথিবী কখনই সমঘন পদার্থ দ্বারা গঠিত নয়। ভূজঠরের গভীর প্রদেশের স্তরগুলি উপরের স্তর অপেক্ষা

গুরুভারবিশিষ্ট। ইহারাই দোলককে নিকটে পাইয়া সবলে টানে, এবং তাহার আন্দোলন সংখ্যার বৃদ্ধি করে।

উল্লিখিত পরীক্ষাসিদ্ধ তথ্যগুলির সাহায্যে কি প্রকারে অসমঘন ভূপঞ্জরের গড়-গুরুত্ব নির্ণীত হইয়াছিল, এখন আলোচনা করা যাউক। কারণ, ইহা স্থিরীকৃত হইলে, সমগ্র পৃথিবীর ঘনফলকে গড়-গুরুত্ব দিয়া গুণ করিলেই পৃথিবীর গুরুত্ব বাহির হইয়া পড়ে। গড়-গুরুত্ব স্থির করিতে হইলে প্রথমে দুইটি অসম বস্তু পরস্পরকে কি প্রকার বলে আকর্ষণ করে, তাহা পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিতে হয়। তা'র পর সেই দুই জিনিষকেই খুব গভীর আকরের ভিতর লইয়া গিয়া সেখানে তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণ-পরিমাণ কি প্রকার দাঁড়ায়, তাহা লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই দুই আকর্ষণকে কখনই সমান দেখা যায় না। ভূগর্ভের গভীর প্রদেশের শিলা, পদার্থদুটিকে নিকটে পাইয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে টানিতে আরম্ভ করে। বৈজ্ঞানিকগণ আকর্ষণের এই পার্থক্য লইয়া হিসাব করিয়া কেবল গণিতের সাহায্যে পৃথিবীর গড়-গুরুত্ব স্থির করিয়াছেন। ভূগর্ভে লইয়া গেলে দোলকের যে আন্দোলন-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহা লইয়া হিসাব করিয়াও কয়েকজন পণ্ডিত গড়-গুরুত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

সমগ্র পৃথিবীর ঘনফল পাইলে, এবং ভূস্তরের গড়-গুরুত্ব জানা থাকিলে কাগজ-কলমে পৃথিবীর গুরুত্ব ঠিক করা কঠিন হয় না। কিন্তু যে দুটি মূল তথ্য অবলম্বন করিয়া গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে, তাহা স্থির করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকদিগকে অনেক আয়োজন করিতে হইয়াছিল এবং সুদীর্ঘকাল নানা আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ইঁহারা অতিকষ্টে প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ এয়ারি সাহেব উপর্য্যুপরি দুইবার গড়-গুরুত্ব নিরূপণের জন্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের এক এক গভীর কয়লার খনির নীচে

গিয়া এই সকল পরীক্ষা আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার যন্ত্রটি দুই-বারই বিকল হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। বহুকালের আয়োজন নিমেষে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া পরীক্ষক হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত এয়ারি সাহেব এবিষয় লইয়া আর চিন্তা করেন নাই। ত্রিশ বৎসর পরে নূতন আয়োজনে আবার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। এবৎসরে আর কোন প্রকার বিঘ্ন হয় নাই; নিরাপদে পরীক্ষা শেষ করিয়া এয়ারি একটা গড়-গুরুত্ব স্থির করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষাগুলিকে সফল করিবার জন্য পরীক্ষক দীর্ঘকালের শ্রমে যে সকল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। পরীক্ষার স্থান মনোনীত হইলে তাহার চারিদিকের পাহাড়-পর্ব্বতের আকর্ষণ যাহাতে যন্ত্রের দোলককে টানিয়া হিসাবে ভুল আনয়ন করিতে না পারে, পূর্ব্ব তইতে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কাজেই, পরীক্ষা স্থানের চারিদিকে পাহাড়-পর্ব্বতস্থ শিলার আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp. Gravity) স্থির রাখা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল এই ব্যাপারেই এয়ারি সাহেব চারি বৎসর ধরিয়া অবিরাম পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর গুরুত্বের কথা উঠিলেই, এখন কেবল সার্ হেন্‌রি জেম্‌স্ ও এয়ারি সাহেবের কথা মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু সত্যকথা বলিতে গেলে ইঁহাদিগকে কখনই এই কার্য্যে অগ্রণী বলা যাইতে পারে না। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ক্যাভেণ্ডিস্ সাহেবই ইহার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ক্যাভেণ্ডিসের গণনার সহিত এয়ারি সাহেবের আবিষ্কারের অনেক অনৈক্য থাকিলেও, সেই অবৈজ্ঞানিক যুগের নানা অসুবিধার ভিতরে থাকিয়াও এয়ারি সাহেব পরীক্ষায় যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

ক্যাভেণ্ডিস্ সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া হেন্‌রি জেম্‌স্ ও এয়ারি-প্রমুখ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সকলেই স্বাধীনভাবে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেকেরই গণনায় এক একটা পৃথক্ ফল পাওয়া গিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ সার্ হার্সেল, ঐ সকল ফল লইয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। গণনালব্ধ নানাফলের মধ্যে খুব অধিক পার্থক্য না থাকিলেও, উহাদের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক্, তাহার অবধারণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। হার্সেল সাহেব পৃথিবীর গড়-গুরুত্ব সম-আয়তন জলের গুরুত্ব অপেক্ষা প্রায় সাড়ে পাঁচগুণ অধিক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অদ্যাপি হার্সেলের এই সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে।

পৃথিবীর ব্যাসের পরিমাণ আট হাজার মাইলের কিঞ্চিৎ অল্প ধরিয়া এবং ভূপঞ্জরস্থ পদার্থের গড়-গুরুত্ব সাড়ে পাঁচ মাইল লইয়া হিসাব করিলে সসাগরা পৃথিবীর গুরুত্ব প্রায় ৫,৮৫,২০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০, টন্ হইয়া দাঁড়ায়। সৌর পরিবারস্থ গ্রহ উপগ্রহ-গুলির মধ্যে পৃথিবী ক্ষুদ্র হইয়াও আমাদের হিসাবে কত বৃহৎ, এখন পাঠক অনুমান করুন।

ভূকম্পন

ঝড়বৃষ্টি এবং বৈদ্যুতাগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতে আমাদের যে ক্ষতি করে, ভূমিকম্পে তাহা অপেক্ষা বড় অল্প ক্ষতি হয় না। বড় বড় ঝড়ের আগমনবার্ত্তা আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্ততঃ কিছু পূর্ব্বে জানা যায়। সুতরাং একটু সতর্ক হইবার অবকাশ থাকে। কিন্তু ভূমিকম্পের আগমন একেবারে আকস্মিক। ইহাতে মেঘাড়ম্বর বা ঘন ঘটা নাই, গর্জ্জন বর্ষণ নাই। যখন সকলে নিশ্চন্ত, হয় তো গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন, সেই সময়ে হঠাৎ ভূমিকম্প উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়া দেয়। ইহার স্থানাস্থান বা কালাকাল নাই।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ভূমিকম্পবহুল স্থানগুলির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের আকর্ষণের সহিত ভূমিকম্পের দূর-সম্বন্ধের কল্পনাও করিয়াছেন, কিন্তু প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট স্থানকাল-অনুসারে ভূমিকম্প হয় না। মানচিত্রের যে সকল অংশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনাজ্ঞাপক কালো রেখা অঙ্কিত নাই, সেই সকল স্থানও এখন ভূমিকম্পের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতেছে না।

বহুদিন হইল আমার এক বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট গল্প শুনিয়াছিলাম, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ, সূর্য্যের উদয়াস্ত প্রভৃতি ঘটনাগুলি স্বর্গের ব্যাপার। স্বর্গের সহিত হিন্দুশাস্ত্রের সম্বন্ধটা খুব ঘনিষ্ঠ। কাজেই, শাস্ত্রকারগণ গ্রহণাদির কাল অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারেন। ভূমিকম্পের উৎপত্তি পাতালে। সুতরাং খৃষ্টান্ মুসলমান প্রভৃতি যে সকল জাতি মৃতদেহ মাটিতে পুতিয়া পাতালের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, ভূমিকম্পের রহস্য আবিষ্কার করার অধিকার কেবল তাহাদেরি আছে। বৃদ্ধা কথাগুলি যে-ভাবে বলুক না কেন, এখন দেখিতেছি, তাহার কথার সার্থকতা আছে।

আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ চন্দ্রসূর্য্য এবং গ্রহ-উপগ্রহাদির গতিবিধি অতি সূক্ষ্মভাবেই গণনা করিতে পারিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা আধুনিক জ্যোতিষীদিগের ন্যায় বড় বড় দূরবীণ্ বা পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী অপর কোন যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহারা কেবল পরিবীক্ষণ দ্বারা যে সকল অত্যাশ্চর্য্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। ভূমিকম্প কেন তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, জানি না; কেবল পরিবীক্ষণ দ্বারা ব্যাপারটি আলোচনা করিলে হয় তো তাঁহারা অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিতেন। এখন যাঁহারা ভূকম্পনসম্বন্ধীয় গবেষণা করিয়া ইহার কালাকাল নির্ণয়ের উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই পাতালের সহিত সম্বন্ধ আছে,—প্রায় সকলেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী।

আজকাল ভূমিকম্প-সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা চলিতেছে, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও তাহার লেশমাত্র ছিল না। সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো, মাণ্টা, পূর্ব্ববঙ্গ, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি স্থানের বৃহৎ ভূমিকম্পগুলির পর যেন বিষয়টি বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এখন নানাদেশের বড় বড় সহরমাত্রেই ভূকম্পনবীক্ষণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুযোগ্য বৈজ্ঞানিকগণ সেই সকল স্থানে বসিয়া হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের ভূমিকম্পের পরিচয় গ্রহণ করিতেছেন। এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফলে, ভূকম্পন সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার ছিল, তাহা একে একে দূর হইয়া যাইতেছে, এবং যে সকল স্থানে সত্যই প্রবল ভূমিকম্পের আশঙ্কা আছে, তাহাও জানা যাইতেছে। এই নূতন আবিষ্কারগুলিকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল সহরকে ভূমিকম্পের অধিকারভুক্ত বলিয়া স্থির করিতেছেন, এখন নূতন পদ্ধতিতে সেই সকল স্থানে গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে। পূর্ব্বে বড় বড় ভূমিকম্পে যে প্রকার লোকক্ষয় হইত, সম্ভবতঃ এখন নিশ্চয়ই আর সে

প্রকার হইবে না। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভূমিকম্পকে আকস্মিক প্রাকৃতিক উৎপাতের কোটায় ফেলিতেন। বোধ হয় এইজন্যই তাঁহারা ইহার বিশেষ আলোচনা হইতে বিরত ছিলেন। ভূকম্পনবীক্ষণ (Seismograph) যন্ত্রের উদ্ভাবনের পর এই কুসংস্কারও দূর হইয়া গিয়াছে। বায়ুর প্রবাহ, মেঘের উৎপত্তি যেমন সুলভ প্রাকৃতিক ব্যাপার, বৈজ্ঞানিকগন ভূকম্পনকেও ঠিক সেইরূপই দেখিতেছেন। হিসাবে দেখা যায়, প্রতিবৎসর পৃথিবী প্রায় ছয়শতবার কাঁপিয়া উঠে। কাজেই, এত বৃহৎ এবং সুলভ প্রাকৃতিক ব্যাপারকে এখন আর উপেক্ষা করা চলিতেছে না। এই জন্য ভূকম্পনসংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আধুনিক বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত করিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জগতের সর্ব্বাংশেই দেখা যাইতেছে। কেবল পর্য্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহ দ্বারা ঝড়-বৃষ্টির উৎপত্তি-নিবৃত্তির কালের অনেক রহস্য ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং সেই পদ্ধতিক্রমে যে ভূমিকম্পের কালাকাল এবং স্থানাস্থানসম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব জানা যাইবে না, একথা কেহই বলিতে পারেন না।

সম্প্রতি অধ্যাপক ম্যাকিয়নি (Atto Macioni) ভূমিকম্পের কাল-নিরূপণের জন্য যে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। অধ্যাপকটি নিতান্ত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নহেন। নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য পণ্ডিতমহলে তাঁহার বেশ সুনাম আছে। সুতরাং তাঁহার আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনায়াসেই বলা যায়, ভূকম্পের আগমনবার্ত্তা জানা বোধ হয় এখন আর কঠিন হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপকটি কেবল পরিবীক্ষণ দ্বারা ভূকম্পনের আগমন সংবাদ জানিবার কৌশলটি জানিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষ ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি আকস্মিক প্রাকৃতিক উৎপাতের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। আকাশ বেশ মেঘনির্ম্মুক্ত, হঠাৎ পশ্চিমে একখণ্ড মেঘ উদিত হইয়া প্রকাণ্ড ঝড়-

বৃষ্টির সূচনা দিল। এ প্রকার ঘটনা অপর দেশে দুর্লভ। যাঁহারা প্রকৃতির এই সকল লীলা একটু মন দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন, চঞ্চল হইবার পূর্ব্বেই প্রকৃতি তাহার স্বাভাবিক ভাব ত্যাগ করিয়া অসম্ভব গম্ভীর হইয়া পড়ে। বৃহৎ ঝড়ের পূর্ব্বকার এইপ্রকার অস্বাভাবিক শান্তভাব অতি সুস্পষ্ট বুঝা যায়। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ, ঝড়বৃষ্টির সময় মানুষের ন্যায় নিরাপদ স্থান সহজে খুঁজিয়া লইতে পারে না। কাজেই, প্রকৃতির পরিবর্ত্তনগুলির ফলাফল বুঝিয়া লইয়া তাহাদিগকে চলাফেরা করিতে হয়। এইজন্য আকস্মিক প্রাকৃতিক উপদ্রবের সম্ভাবনা ইহারা নানা প্রকার লক্ষণ দেখিয়া অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারে। দৈনিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া যখন আসন্ন ঝড় বা বৃষ্টির সম্ভাবনা আমরা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না, পক্ষিগণ তাহা অনায়াসে বুঝিয়া নিজেদের বাসার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে।

অধ্যাপক ম্যাকিয়নি বলিতেছেন, কেবল ঝড়বৃষ্টি নয়, ভূমিকম্পেরও আগমনের পূর্ব্বে এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না; কিন্তু পশুপক্ষীরা অনায়াসে বুঝিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে থাকে। ম্যাকিয়নি সাহেব প্রথমে এইগুলির বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

বড় ভূমিকম্পের আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে প্রায়ই কতকগুলি মৃদুকম্পন দেখা দেয়। ইতর প্রাণিগণ তাহাদের তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা সেগুলি অনুভব করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করে, এই কথাই প্রথমে ম্যাকিয়নি সাহেবের মনে হইয়াছিল। কিন্তু ভূমিকম্পন-বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করায় তাঁহাকে ঐ অনুমান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যন্ত্রে মৃদু ভূমিকম্পনের সুস্পষ্ট রেখাপাত হইতেছে, অথচ পশুপক্ষিগণ নির্ভীক মনে বিচরণ করিতেছে, এপ্রকার দৃশ্য তিনি একাধিক বার

সুস্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। কাজেই, ভূকম্পনের পূর্ব্বলক্ষণ আবিষ্কারের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রবল ভূমিকম্পের অনেক পূর্ব্বে যে সকল মৃদুকম্পন সুরু হয় তাহা প্রস্তর এবং ভূপ্রোথিত শিলাগুলির মধ্যে এক সংঘর্ষণ উপস্থিত করে। ঘর্ষণ হইলেই তাপ ও বিদ্যুতের উৎপত্তি অনিবার্য্য। কাজেই, ভূমিকম্পের প্রবল আক্রমণের পূর্ব্বে ভূতল বিদ্যুৎ-যুক্ত হওয়া কোনক্রমেই বিচিত্র নয়। অধ্যাপক ম্যাকিয়নি এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া মনে করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ পশুপক্ষিগণ ভূকম্পনের পূর্ব্বক্ষণে ঐ স্তরের ঘর্ষণজাত বিদ্যুতের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইয়া পড়ে।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগকে বিদ্যুতের যুগ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অতি সামান্য বিদ্যুতের অস্তিত্ব জানিয়া তাহার কার্য্যাদি পরীক্ষা করিবার অনুরূপ নানাপ্রকার যন্ত্র এখন অতি ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারেও সজ্জিত পাওয়া যায়। সুতরাং ভূকম্পনের পূর্ব্বকার মৃদুকম্পন দ্বারা যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহার অস্তিত্ব বুঝিবার জন্য ম্যাকিয়নি সাহেবকে কোন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে হয় নাই। তিনি মনে করিয়াছেন, তারহীন টেলিগ্রাফ (Wireless Telegraphy) যন্ত্রে যেমন বহুদূরের বৈদ্যুতিক সঙ্কেত গ্রহণ করা যায়, সেইপ্রকার কোন এক উপায়ে নিশ্চয়ই ভূকম্পনের পূর্ব্বকার বিদ্যুতের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, তারহীন টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আকারপ্রকার যতই জটিল হউক না কেন, যে মূল ব্যাপারটি লইয়া উহা গঠিত, তাহা অতি সরল। সে সংবাদ প্রেরণ করে, সঙ্কেত অনুসারে বিদ্যুৎনিঃসরণ (Discharge) করাই তাহার কাজ। সাধারণ রুমকর্ফস্ কয়েলের (Ruhmkorffs Coil) মত কোন যন্ত্র দ্বারা এই কার্য্য করা হইয়া থাকে। সর্ব্বব্যাপী ঈথরে তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে

যখন সেই নিঃসরণগুলি বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে ছুটিতে থাকে, তখন তাহাদিগকে যন্ত্রের ফাঁদে ফেলিয়া সঙ্কেত আদায় করা সংবাদ-গ্রাহকের একমাত্র কাজ। সংবাদ-গ্রাহক যন্ত্রের মূল ব্যাপারটিও অতি সহজ। যন্ত্রটি (Coherer) কতকগুলি লোহার গুঁড়ায় পূর্ণ রাখা হয়, এবং ব্যাটারির তারের দুই প্রান্ত সেই গুঁড়ার সহিত সংযুক্ত থাকে। সাধারণতঃ লোহার গুঁড়ার ভিতর দিয়া ব্যাটারির বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে পায় না। কিন্তু প্রেরকের যন্ত্র হইতে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছুটিয়া আসে, তাহা গুঁড়ায় ঠেকিলেই ব্যাটারির বিদ্যুৎ লৌহচূর্ণের ভিতর দিয়া চলিতে সুরু করে, এবং তরঙ্গের আগমন বন্ধ হইলে প্রবাহও বন্ধ হইয়া যায়। এই প্রকারে প্রেরকের যন্ত্র দ্বারা গ্রাহকের কলে যে সকল ক্ষণিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারাই প্রেরকের সঙ্কেতগুলিকে বুঝিয়া লওয়া হইয়া থাকে। অধ্যাপক ম্যাকিয়নি ভূমিকম্পের পূর্ব্বেকার বিদ্যুতের অস্তিত্ব বুঝিবার জন্য ঐপ্রকার একটা কল (Coherer) পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। বার্ত্তাবহ যন্ত্রের বিদ্যুৎ ভূস্তর দিয়াই সঞ্চলন করে। এইজন্য যন্ত্রটিকে মৃত্তিকা-সংলগ্ন রাখা হইয়াছিল। ছোট বড় নানা ভূমিকম্পের লক্ষণ ভূকম্পন-বীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেল, কিন্তু ম্যাকিয়নির কলে তাহার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। ইহাতে তিনি হতাশ হন নাই। যাহাতে মৃদু বিদ্যুতের লক্ষণ ধরা যায়, এ প্রকার একটি যন্ত্র তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং ভূমিকম্পের পূর্ব্বেকার বিদ্যুৎ পৌছিলে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, সেইপ্রকার এক ব্যবস্থাও কলে রাখিয়াছিলেন।

বহুদিন কলের ঘণ্টায় বিদ্যুতের সাড়া পাওয়া যায় নাই। ভূ-কম্পন-বীক্ষণ যন্ত্রেও কোনও মৃদু কম্পনের রেখাপাত হয় নাই। ইহার পর গত ১১ই এপ্রিল তারিখে সহসা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সাধারণ ভূ-কম্পন-বীক্ষণ যন্ত্রে মৃদু কম্পনের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণটি অধ্যাপক ম্যাকিয়নি স্বয়ং সিয়ানা নগরের (Sienna) এক বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে পাঠ করিয়াছিলেন, সুতরাং উহার সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। কাজেই, বলিতে হয়, ভূমিকম্পের কাল এখন হইতে অজ্ঞাত থাকিবে না। অন্ততঃ কয়েক মিনিট পূর্ব্বে যন্ত্রসাহায্যে ভূমিকম্পের আগমন-সংবাদ জানিয়া আমরা সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিব।

জ্ঞানের সীমা নাই। সুতরাং এই ক্ষুদ্র প্রারম্ভ হইতে আমরা ভূকম্পন সম্বন্ধে যে, আরও অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ভারতের পূর্ব্ব সীমাস্থ আসাম প্রভৃতি স্থানগুলি ভূমিকম্পবহুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতিদিনই উহাদের কোন না কোন অংশে ভূমিকম্পন অনুভূত হয়। সুতরাং এইপ্রকার স্থানে ম্যাকিয়নি সাহেবের প্রদর্শিত পন্থার পরীক্ষা আরম্ভ করিলে, সুফল প্রাপ্তির খুবই সম্ভবনা। ভগবান মঙ্গলময়, তাঁহার প্রতি কার্য্যই মঙ্গলকে পূর্ণ করিবার জন্য নিযুক্ত হয়। কিন্তু কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্য এবং মঙ্গলের যোগসাধন হইতেছে, তাহা আমরা সহজে বুঝি না। ইহা স্থির করা সত্যই সাধনার বিষয়। গত ১৮৯৬ সালে যে ভূমিকম্প আসাম প্রদেশ ও পূর্ব্বঙ্গকে কাঁপাইয়াছিল, তাহা আধুনিক বৃহৎ ভূমিকম্পগুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ইহার উৎপত্তি-তত্ত্ব আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে; এবং একপ্রকার একটা বৃহৎ বিপ্লব দ্বারা প্রকৃতির কোন্ মঙ্গল কার্য্যটি সুসাধিত হইল, তাহাও অদ্যাপি কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক ম্যাকিয়নি ভূমিকম্পের গবেষণাসম্বন্ধে যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, হয় তো তাহাই কোন একদিন এই সকল রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিবে।

পৃথিবী ও সূর্য্যের তাপ

পৃথিবী ও সূর্য্যের তাপ বহুকাল হইতে জড়বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। অতি-প্রাচীনকালে যেদিন প্রকৃতির রহস্য প্রথমে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই পৃথিবী ও সূর্য্যের তাপোৎপত্তির কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু অদ্যাপি সেই যুগযুগান্তরব্যাপী চেষ্টার সাফল্য দেখা যাইতেছে না।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভাবিতেন,—কাঠ বা কয়লা জ্বালাইলে, তাহা যে প্রকার তাপালোক বিকিরণ করে, সূর্য্যটা বুঝি সেই রকমের একটা দাহ্যপদার্থের বৃহৎ স্তূপ। তা'র পর যখন হিসাবে দেখা গেল,—সূর্য্য যদি কেবল অঙ্গারময়ই হইত, তবে তাহার সমস্ত অঙ্গার চারি পাঁচহাজার বৎসরে একেবারে পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, তখন প্রাচীন পণ্ডিতদিগের চমক্ ভাঙিল। অনেকেই সূর্য্যের তাপোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধানে লাগিয়া গেলেন।

এই পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে কল্পনা করিয়া লইলেন,—আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটিতে প্রতিদিনই যেমন হাজার হাজার ছোট-বড় উল্কাপিণ্ড আসিয়া পড়ে, বিশাল সূর্য্যদেহে নিশ্চয়ই প্রতিমুহূর্ত্তে সেই প্রকার কোটি কোটি উল্কার পতন হয়। কিন্তু চলিষ্ণু পদার্থের গতি হঠাৎ অবরুদ্ধ হইলে, তাহা দ্বারা যে প্রচুর তাপের উৎপত্তি হয়, তাহা ত আমরা প্রতিদিনই দেখিয়া আসিতেছি। স্থির হইল, সূর্য্যগোলকে যে, অজস্র উল্কাবর্ষণ হইতেছে, সেই উল্কাগুলির অবরোধ ও ঘর্ষণজাত তাপই সূর্য্যের তাপভাণ্ডারকে পূর্ণ রাখিয়াছে।

ইহা ছাড়া, সূর্য্যমণ্ডলস্থ নানা পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগে যে তাপ হয়, তাহাকেও সূর্য্যের তাপরক্ষার কারণ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন।

সৌর-তাপোৎপত্তি-সম্বন্ধে এই কথাগুলি এককালে পণ্ডিতসমাজে খুব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগের প্রারম্ভে সিদ্ধান্তটির উপর অনেক সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন উঠিল,—যদি সৌরমণ্ডলে অজস্র উল্কাবর্ষণই সম্ভবপর হয়, তবে সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত উল্কা কি সূর্য্যেদেহকে পুষ্ট করিত না? এবং সেই পুষ্টাবয়ব সূর্য্যের আকর্ষণবৃদ্ধির সহিত সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্বে কি একটা বিশৃঙ্খলার লক্ষণ প্রকাশ পাইত না?

আমরা প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণে সূর্য্যকে ত অণুমাত্র পরিপুষ্ট দেখি না, এবং গ্রহ-উপগ্রহাদির চলাফেরাতেও ত দুই একহাজার বৎসরে কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। অনেকের মনে হইল,—তবে কি প্রকারে উল্কাবর্ষণকেই সৌরতাপরক্ষার কারণ বলিয়া নিশ্চিত থাকা যায়?

বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন, কথাটা নিতান্ত উড়াইয়া দিবার মত নয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিক মিলিয়া সৌরতাপ জন্মাইবার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে লাগিয়া গেলেন।

এই অনুসন্ধানে সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণপণ্ডিত হেল্‌ম্‌হোলজ্‌ সাহেবও যোগ দিয়াছিলেন। ইনি কিছুদিন পরীক্ষাদি করিয়া বলিলেন,—কোন বাষ্পময় পদার্থকে সঙ্কুচিত করিলে, সেই সঙ্কোচ দ্বারা যে তাপের উৎপত্তি হয়, তাহা ত আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। সূর্য্যদেহের অন্ততঃ কতকটা যে বাষ্পময়, তাহার ত প্রচুর প্রমাণ আছে। সুতরাং তাপবিকিরণ দ্বারা সৌরবাষ্পাবরণ সঙ্কুচিত হইলে, যে তাপের উৎপত্তি হয়, তাহাই সূর্য্যের তাপরক্ষার পক্ষে প্রচুর নয় কি?

হেল্‌মহোল্‌জ্‌ সাহেব একধারে মহাবৈজ্ঞানিক ও অসাধারণ গণিতবিৎ ছিলেন। তিনি গণিতসাহায্যে স্পষ্ট দেখাইলেন, তাপবিকিরণজাত সঙ্কোচই সেই তাপপূরণের পক্ষে প্রচুর, এবং এই সঙ্কোচের পরিমাণ

এত অল্প যে, দুই চারিহাজার বৎসরের পর্য্যবেক্ষণেও আমরা পৃথিবী হইতে তাহা বুঝিতে পারিব না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের নেতা লর্ড কেল্‌ভিন্‌ ও টেট্‌ প্রমুখ পণ্ডিতগণ হেল্‌ম্‌হোল্‌জের সিদ্ধান্তে পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিলেন এবং গণনা দ্বারা স্থির হইল, সূর্য্যদেব এখনো আড়াইকোটি বৎসর ব্যাপিয়া সঙ্কুচিত হইতে হইতে তাপালোক বিকিরণ করিতে থাকিবেন, এবং তার পর সৌরজগতে এক মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত হইবে।

হেল্‌ম্‌হোল্‌জের এই আকুঞ্চনসিদ্ধান্তটিই এপর্য্যন্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিয়াছিল। ভাবা গিয়াছিল, বিজ্ঞানরথী হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্‌ ও লর্ড কেল্‌ভিনের পরিণত মস্তিষ্ক হইতে যে সিদ্ধান্তের উৎপত্তি, তাহার বুঝি কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে না। কিন্তু আজকাল সৌরতাপোৎপত্তিসম্বন্ধে আবার একটি নূতন কথার সূচনা দেখা যাইতেছে।

অধ্যাপক স্নাইডারনামক জনৈক বৈজ্ঞানিক অল্প দিন হইল প্রচার করিয়াছেন, রেডিয়াম্‌ নামক যে একটি ধাতু নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে, সূর্য্যের বর্ণাবরণে (Chromosphere) তাহা প্রচুরপরিমাণে আছে। অধ্যাপকটির মতে এই ধাতুটিই সৌর তাপ ও আলোকের মূল কারণ। তা ছাড়া, রেডিয়ম্‌ সহজ অবস্থাতে যে তাপ ও রশ্মি প্রচুর পরিমাণে ত্যাগ করে, তাহা অবলম্বন করিয়া সূর্য্য ও নক্ষত্রের আরো অনেক রহস্যের মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে।

সূর্য্যে কলঙ্কের (Sunspots) আবির্ভাব-তিরোভাব একটা বড় রহস্যময় ব্যাপার। প্রতি এগারো বৎসর অন্তর এই কলঙ্ক প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। আজকাল অনেক পণ্ডিত অনুমান করিতেছেন, সূর্য্যমণ্ডলস্থ রেডিয়মের উত্তেজনার হ্রাসবৃদ্ধিতে কলঙ্কের আবির্ভাব-তিরোভাব দেখা যায়।

ভূগর্ভস্থ তাপের প্রসঙ্গেও আজকাল রেডিয়মের কথা শুনা যাইতেছে। এই তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—সৃষ্টির সময় পৃথিবী যখন কোন এক অত্যুষ্ণ নীহারিকা হইতে স্খলিত হইয়া জগৎরচনার সূত্রপাত করিয়াছিল, তখন হইতেই তাপ পৃথিবীতে আছে। সৃষ্টির আদিতে এই তাপ অবশ্য খুবই অধিক ছিল, হয় ত তদ্দ্বারা পৃথিবীকে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখা যাইত। কিন্তু পৃথিবী এপ্রকার অবস্থায় অধিক কাল থাকিতে পারে নাই, তাপত্যাগ দ্বারা ক্রমে শীতল হইয়া ইহাকে ক্রমেই বর্ত্তমান অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কোন উষ্ণবস্তু শীতল করিলে অগ্রে তাহার উপরটাই শীতল হইয়া পড়ে;—ভিতরের তাপ বাহির হইতে অনেক সময়ের আবশ্যক হয়। পৃথিবীরও তাই ঘটিয়াছে। ইহার উপরটা শীতল হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই আদিমতাপের যে অংশটা ভূগর্ভে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। কাজেই ভূপৃষ্ঠের তুলনায় ভূগর্ভকে অত্যন্ত উষ্ণ দেখায়।

প্রতি বৎসর পৃথিবী কি পরিমাণ তাপ বিকিরণ করে, তাহা ঠিক করা কঠিন নয়। এই প্রকার একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া আজ কয়েক বৎসর হইল লর্ড কেল্‌ভিন পৃথিবীর জন্মকাল পর্য্যন্তও ঠিক করিয়াছেন।

সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রদার্‌ফোর্ড সাহেব ভূগর্ভের তাপসম্বন্ধীয় প্রচলিত সিদ্ধান্তটিকে উল্টাইয়া দিতে চাহিতেছেন। ইনি বলিতেছেন—সেই আদিম তাপ এবং এখনকার রাসায়নিক সংযোগবিয়োগ-জাত তাপ ভূগর্ভের উষ্ণতারক্ষার পক্ষে প্রচুর নয়। নূতন-আবিষ্কৃত রেডিয়ম্ ও সেই শ্রেণীর ধাতুগুলির কার্য্য আলোচনা করিলে তাহাদিগকেই তাপরক্ষার মূল বলিয়া মনে হয়।

হিসাবে দেখা যায়, এক পাউণ্ড রেডিয়ম্ ধাতু এক বৎসরে যে তাপ ত্যাগ করে, তাহা একশত পাউণ্ড উৎকৃষ্ট কয়লার দহনজাত তাপের

সমান। এই তাপবিকিরণে রেডিয়মের ক্ষয় হয় সত্য, কিন্তু এই ক্ষয় এত অল্প যে, পঞ্চাশ বাট বৎসরেও তাহার লক্ষণ দেখা যায় না। তা ছাড়া এই তাপবিকিরণক্ষমতা কেবলমাত্র রেডিয়মেরই গুণ নয়। হেলিয়ম্, থোরিয়ম্ প্রভৃতি অনেক ধাতুতেই ঐ গুণ সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে। এই সকল দেখিয়া রদার্‌ফোর্ড সাহেব স্থির করিয়াছেন, আমাদের পৃথিবীর আকাশে ও মৃত্তিকাতে রেডিয়ম্ ও তজ্জাতীয় যে সকল ধাতু প্রচুর-পরিমাণে আছে, তাহাই তাপ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর উষ্ণতা রক্ষা করিতেছে। ঘরে আগুন জ্বালাইলে আগুনে ঘরটি যেমন বেশ গরম হইয়া উঠে, ভূপৃষ্ঠস্থ রেডিয়ম্‌জাতীয় নানা ধাতু সেই প্রকার তাপ বিকিরণ করিয়া আমাদের আকাশটিকে বেশ গরম করিয়া রাখিতেছে।

পৃথিবীতে রেডিয়ম্ জিনিষটা অতি অল্পই আছে সত্য, কিন্তু রেডিয়ম্-জাতীয় অপর জিনিষের বড় অভাব নাই। ইহা দেখিয়া রদার্‌ফোর্ড সাহেব বলিতেছেন, এখনো ভূপৃষ্ঠে তাপবিকিরণক্ষম যতগুলি ধাতু আছে, পৃথিবীর তাপরক্ষার পক্ষে তাহাই প্রচুর।

লর্ড কেলভিন্ যে হিসাবে পৃথিবীর জন্মকাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, রদার্‌ফোর্ড সাহেব সেই হিসাবেই দেখাইতেছেন যে, পৃথিবীতে সাতাইশকোটি টন্ রেডিয়মের অস্তিত্ব থাকিলে, তাহাব তাপেই ভূগর্ভের উষ্ণতা রক্ষা হইতে পারে। এল্‌ষ্টের ও গায়টেল্ নামক দুইজন জার্ম্মান্ পণ্ডিতের গবেষণায় দেখা গিয়াছে, সমগ্র ভূদেহে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ রেডিয়ম্ প্রকৃতই আছে। তা ছাড়া, গভীর কূপ ও ঝরণার জল এবং সমুদ্রের কর্দ্দমাদিতে যে সকল রেডিয়ম্ মিশ্রিত থাকে, তাহা দেখিয়া ভূদেহের রেডিয়ম্‌প্রাচুর্য্যে আর কেহ বড় অবিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না।

অতি অল্পদিনই হইল, রদার্‌ফোর্ডের এই সিদ্ধান্তটি প্রচারিত হইয়াছে। নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ এসম্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করেন, শুনিবার জন্য সমগ্র জগৎ আজ উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

নূতন রসায়ন-শাস্ত্র

এমন কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের নাম করিতে পারা যায় না, যাহা কেবল এক জন বৈজ্ঞানিকই তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনের চেষ্টায় ঠিকমত গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকেরই ইতিহাসে নানা কালের নানা বৈজ্ঞানিকের হস্তচিহ্ন সুস্পষ্ট নজরে পড়ে। আলোকের প্রচলিত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠায় ইয়ং ও ফ্রেজ্‌নেল সাহেবের খুব দাবি আছে সত্য কিন্তু নিউটন্ ও ডেকার্টেকে ঐ প্রতিষ্ঠাতৃগণের সহিত একাসনে বসাইয়া সম্মান না করিলে, বিচারমূঢ়তা প্রকাশ করা হয়। ইঁহারা আলোকতত্ত্বের যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলিকে হাতের গোড়ায় না পাইলে, আজ ঈথরীয় সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইত। নব্য রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাও কোন এক বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয় নাই। একশত বৎসর ধরিয়া নানা পণ্ডিত যে সকল অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা লইয়াই নব্য রসায়ন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

এসিড্‌যুক্ত জলে ব্যাটারির দুই প্রান্তের তার ডুবাইয়া রাখিলে, এক প্রান্ত হইতে হাইড্রোজন বাষ্প এবং অপর প্রান্ত হইতে অক্সিজেন বাষ্প বাহির হইতে আরম্ভ করে, আজকাল এই ব্যাপারটি সাধারণের এত সুপরিচিত যে, ইহার আর ব্যাখ্যানের আবশ্যক হয় না। কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় বৈজ্ঞানিকও ইহার কথা জানিতেন না। নিকল্‌সন্ সাহেব সর্ব্বপ্রথম এই প্রকারে হাইড্রোজেনের উৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং কারণ অনুসন্ধানের জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঠিক কথা বলিতে গেলে, আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের ভিত্তি নিকল্‌সন্ সাহেব কর্ত্তৃকই ঐ সময়ে প্রোথিত হইয়াছিল, এবং তার পর ডাল্‌টন্, ডেভি, ফ্যারাডে প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণ তাহারি

উপরে রসায়ন-শাস্ত্রকে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রতিমার সৌন্দর্য্যবিধানের গৌরব কুম্ভকার ও চিত্রকরের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে গেলে, সৌন্দর্য্যের কতটা অঙ্গ-বিন্যাসে এবং কতটা তুলিকা চালনায় ফুটিয়াছে হিসাব করা যেমন কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠার গৌরব কোন্ বৈজ্ঞানিকের কতটা প্রাপ্য, তাহা হিসাব করা সেইপ্রকার দায় হইয়া পড়ে।

নূতন রসায়ন-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতৃগণের কথা উঠিলেই, সর্ব্বপ্রথমে ডাল্‌টন্ সাহেবের নাম আমাদের মনে পড়িয়া যায়। এই মহাত্মাই আণবিক সিদ্ধান্তের (Molecular and Atomic Hypothesis) প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আমরা বালি চুণ পাথর প্রভৃতি যে সকল বিচিত্র পদার্থ দেখি, তাহাদের প্রত্যেকটিই এক এক বিশেষ জাতীয় ক্ষুদ্র কণা বা অণু (Molecules) দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ বস্তুর একমাত্র গঠনসামগ্রী তাহাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা অণু। পাথরের কতকগুলি অণু একত্র হইলে পাথর হয়, এবং জলের অণু জোট্ বাঁধিলে জল হয়। তিনি আরো বলিয়াছিলেন, আমরা যেগুলিকে অণু বলিতেছি, তাহারা এক একটা অখণ্ড জিনিষ নয়। দুই বা ততোধিক অংশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা দ্বারা তাহাদের প্রত্যেকটি প্রস্তুত হইয়াছে। এই অতি সূক্ষ্ম জড়কণাগুলিকে ডাল্‌টন্ সাহেব পরমাণু (Atoms) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

পরমাণু অবিনাশী এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া কেবল আশী প্রকারের ভিন্ন জাতীয় পরমাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন অণু সংখ্যায় এত অধিক যে তাহার গণনা চলে না। ব্রহ্মাণ্ডে যতগুলি বিভিন্ন পদার্থ আছে, বিভিন্ন জাতীয় অণুও ঠিক ততগুলিই আছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, ডালটনের কথা সত্য হইলে, এবং আমাদের সূক্ষ্ম দিব্য দৃষ্টি থাকিলে পদার্থকে আমরা সাধারণতঃ যেমন সমঘন দেখি,

কখনই সেপ্রকার দেখিতাম না। অত্যন্ত ঘন ও কঠিন পদার্থও অণুময় হইয়া আমাদের দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং এই সকল অণুর প্রত্যেকটিরই গর্ভে দুই বা ততোধিক ক্ষুদ্র পরমাণু দেখা যাইত। তা' ছাড়া আমরা কোন অণুকে স্থির দেখিতাম না। তাহাদের প্রত্যেকটিই অতি দ্রুত গতিতে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে কম্পিত হইতে থাকিত। মানুষ আজও এইপ্রকার দিব্যদৃষ্টি পায় নাই। অতি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা অণুবীক্ষণ ছাড়া আর সকল কাজই চলে। সুতরাং আমরা যে, শীঘ্র অণু-পরমাণুর সহিত চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করিব, তাহার আশা নাই। কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় ব্যতীত ইহাদের অস্তিত্বের এত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এখন আর তাহার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলা চলে না। অণু জিনিষটা এতই ক্ষুদ্র যে, একখানি ডাকটিকিট যে ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহাতে ইহাদের প্রায় পাঁচলক্ষটিকে একস্তরে সাজানো যাইতে পারে। এক একটি অণু আবার দুই বা ততোধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। সুতরাং এ প্রকার অতিক্ষুদ্র পদার্থকে যদি চক্ষু বা যন্ত্র দ্বারা দেখিতে না পাওয়া যায়, তজ্জন্য চক্ষু বা যন্ত্রকে দোষ দেওয়া যায় না।

ডাল্‌টন্ সাহেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ অণু-পরমাণুর আয়তনের কথা প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহাদের গুরুত্বও স্থির করিয়াছিলেন। কতগুলি হাইড্রোজেনের অণু সমবেত হইলে, রতিপ্রমাণ ভারী হইবে, হিসাবে তাহা জানা যায় নাই বটে, কিন্তু হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা অপর পদার্থের পরমাণু কতগুণ ভারী তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই হিসাবে হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা গন্ধকের পরমাণুকে বত্রিশগুণ ভারী এবং পারদের পরমাণুকে দুইশত গুণ ভারী দেখা গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অসংখ্য সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেকটিই এক এক পৃথক জাতীয় অণুদ্বারা গঠিত, কিন্তু এই অণুগুলিকে বিশ্লেষ করিলে, যে

পরমাণু পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা প্রায় আশীটি মাত্র। অর্থাৎ এই আশী-জাতীয় পরমাণু নানাপ্রকারে পরস্পরের সহিত মিলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির বৈচিত্র্যবিধান করিয়াছে। অণু-পরমাণুর এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পরমাণু সকল কি প্রকারে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, এবং রাসায়নিক কার্য্যে তাহারা কি প্রকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, ডালটন্ সাহেব তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে জানা গিয়াছিল, কোন পরমাণুই কখনো একক ও মুক্তাবস্থায় থাকে না। ইহারা নিকটে কোন বিজাতীয় পরমাণু পাইলেই তাহাদের সহিত মিশিয়া এক একটা অণুর সৃষ্টি করে এবং বিজাতীয় পরমাণুব অভাব হইলে স্বজাতীয় পরমাণুই জোট বাঁধিয়া অণুর রচনা করিতে থাকে। মৌলিক পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে যে সকল অণু পাওয়া যায়, তাহা ঐ প্রকার স্বজাতীয় পরমাণুর সমষ্টি, এবং যৌগিক পদার্থের অণু বিজাতীয় পরমাণুর সমষ্টি।

ডালটন্ সাহেব তাঁহার আবিষ্কার-বিবরণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, অপর পণ্ডিতগণ নানাপ্রকারে প্রতিবাদ করিয়া কথাগুলাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে ডালটনের নিকট সকলকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অণুপরমাণুর সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতি বিষয় বুঝাইবার সময় ডালটন্ সাহেব তাহাদের চিত্র আঁকিয়া বুঝাইতেন। ব্যাপারটা তাৎকালিক পণ্ডিতগণের ভাল লাগে নাই। ডালটনের শিষ্যগণ বীজগণিতের সূত্র অনুসারে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া, গুরুর বক্তব্য বিষয়টাকে সহজ-বোধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজও সেই বীজগণিতি প্রথায় রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সকল প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

ডালটন্ যখন তাঁহার আণবিক সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া জগৎকে চমকিত করিতেছিলেন, ইংলণ্ডের আর এক দিক হইতে হাম্‌ফ্রে

ডেভি নামক একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। রাসায়নিক বিশ্লেষণ-লব্ধ অণুপরমাণুর সহিত ধনাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুতের নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা ইঁহারি মনে সর্ব্বপ্রথমে উদিত হইয়াছিল; আণবিক সিদ্ধান্তের আলোচনাকালীন আমরা দেখিয়াছি, পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে তাহারা কোনক্রমে একক থাকিতে চায় না; স্বজাতীয় বিজাতীয় যে কোন পরমাণুকে নিকট পাইলে তাহাদের সহিত মিলিয়া ইহারা একএকটি অণুর রচনা করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, একই জাতীয় পরমাণুর সম্মিলনে যে সকল অণুর উৎপত্তি হয়, তাহাদের ভিতরকার বাঁধন তত দৃঢ় হয় না—কিন্তু বিজাতীয় পরমাণুর সম্মিলনজাত অণুর পরমাণুগুলি খুব দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ থাকে। ইহাদিগকে কোনমতেই সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না। ডাল্টন্ ও তাঁহার শিষ্যগণ এই পরমাণুর আকর্ষণকে রাসায়নিক আকর্ষণ বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার উৎপত্তি কোথায়, এবং পদার্থ-বিশেষে রাসায়নিক শক্তির প্রাচুর্য্য কেন থাকে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। এই ব্যাপারগুলি ডেভি সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইনি রয়াল ইন্ষ্টিটিউটের প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক ব্যাটারি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় জানা গিয়াছিল, বিদ্যুৎ পরিচালন করিয়া কোন যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে যে দুটা জিনিষ পাওয়া যায়, তাহারা ঠিক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্য করে। আণবিক সিদ্ধান্তের সহিত ইহার যোগ কোথায় এবং রাসায়নিক আকর্ষণ ব্যাপারটা যে কি, ডেভি সাহেবও তাহার সুমীমাংসা করিতে পারেন নাই।

ডেভির পরেই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্যারাডের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইনিও ডেভির ন্যায় বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গবেষণা

আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফ্যারাডে দেখিয়াছিলেন, বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা কোন যৌগিক পদার্থকে বিযুক্ত করিলে, বিদ্যুতের পরিমাণের সহিত বিশ্লিষ্ট পদার্থের পরিমাণের একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ প্রকাশ হইয়া পড়ে। অতি-ক্ষীণ ধারায় জোরাল বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করিলে বহুক্ষণে যে পরিমাণ রাসায়নিক কার্য্য হয়, অতি অল্পক্ষণের দুর্ব্বল প্রবাহ (Low Electro-motive Force) স্থূলধারায় চলিয়া অবিকল সেই কার্য্য করে। প্রবাহের বলবত্তার (Electromotive Force) সহিত রাসায়নিক কার্য্যের কোন সম্বন্ধই ফ্যারাডে সাহেব খুঁজিয়া পান নাই। তা' ছাড়া ইনি আরো দেখিয়াছিলেন, বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে কোন যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিলে ব্যাটারির তারের দুই প্রান্তে যে সকল মৌলিক পদার্থ জম্া হয়, তাহাদের গুরুত্ব তাহাদের পারমাণবিক গুরুত্বের সহিত সমানুপাতী হইয়া দাঁড়ায়। মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব পূর্ব্বপণ্ডিতগণ নিছক্ রাসায়নিক প্রথায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণেও সেই পারমাণবিক গুরুত্বের পরিচয় পাইয়া ফ্যারাডে সাহেব বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাসায়নিক কার্য্যের সহিত বৈদ্যুতিক ব্যাপারের যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে ডেভি সাহেব অনেক পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন। ফ্যারাডের এই সকল আবিষ্কারে ডেভির কথার মর্ম্ম সকলে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক কার্য্য প্রত্যক্ষ এক না হইলেও মূলের কোন এক স্থানে যে উভয়ের ঐক্য আছে, তাহাও সকলে বুঝিয়াছিলেন।

ডেভি ও ফ্যারাডে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেগুলিতে অণুমাত্র কল্পনার কথা ছিল না; সকলগুলিই প্রত্যক্ষ পরীক্ষালব্ধ ব্যাপার। কাজেই, অতি অল্পকাল মধ্যে নবতত্ত্বগুলি

বৈজ্ঞানিক মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ডালটনের পারমাণবিক সিদ্ধান্তের সহিত এই সকল বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক কার্য্যের যোগ কোথায়, তাহা ডেভি বা ফ্যারাডে কেহই দেখাইতে পারেন নাই।

পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রের উন্নতিকালকে যদি দুইভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায়, তবে ডালটন্ ডেভি ও ফ্যারাডের গবেষণাকালকে রসায়নের প্রাচীন যুগ বলিতে হয়। ইঁহারা সেই সময়ে ইহাকে যে মূর্ত্তি দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, নব্য রসায়নশাস্ত্রের আর সে মূর্ত্তি নাই। নানা বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়িয়া ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি প্রকারে রসায়নশাস্ত্রের নূতন আকার দিয়াছেন, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক।

যে সকল পাঠক আধুনিক বিজ্ঞানের খবর রাখেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই গতি-সিদ্ধান্তের (Kinetic Theory) কথা শুনিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, আমরা যাহাকে তরল পদার্থ বলি, তাহা কেবল অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সচল অণুর সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি ঐ গতিশীল অণুগুলিকে কাছাকাছি রাখে। কিন্তু এই আকর্ষণ এত প্রবল নয় যে, তাহা দ্বারা অণুগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া দৃঢ় আবদ্ধ থাকিতে পারে। কাজেই, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু অবকাশ থাকিয়া যায়। গতিসিদ্ধান্তিগণ বলেন, তরল পদার্থের অস্থির অণুগুলি সর্ব্বদাই ঐ অতি-সঙ্কীর্ণ ব্যবধানের ভিতর দিয়া চলাফেরা করে।

ব্যাটারির দুইপ্রান্তসংলগ্ন তার তরল পদার্থে ডুবাইলে ব্যাটারির বিদ্যুৎ-দ্বারা কতকগুলি পদার্থকে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায়। বিশুদ্ধ জলের ভিতর দিয়া ঐ প্রকার বিদ্যুৎ চালাইলে জল বিশ্লিষ্ট হয় না। কিন্তু এসিড্, ক্ষার ও নানা লবণজাতীয় পদার্থ, এই প্রকারে অতি

সহজেই মৌলিক উপাদানে পৃথক্ হইয়া পড়ে। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করা যাউক, যেন হাইড্রোক্লোরিক এসিডের * ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালনা করা হইতেছে। এই পরীক্ষায় এসিডে নিমজ্জিত তারদ্বয়ের একটির গা দিয়া স্পষ্ট ক্লোরিন্ বাষ্প বাহির হইতে আরম্ভ করিবে, এবং অপরটি হইতে হাইড্রোজেন্ উঠিতে থাকিবে এই দুইটি বাষ্প যে, হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের বিশ্লেষণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহাতে আর সন্দেহ করিতে পারা যায় না। কারণ এই দুই বাষ্পকে যদি কেহ সংগ্রহ করেন, এবং কোন পাত্রে রাখিয়া তাহাতে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করেন, তবে উভয়ের সংযোগে আবার হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডেরই উৎপত্তি হইয়া পড়িবে।

পূর্ব্বের উদাহরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যে রাসায়নিক শক্তি হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের পরমাণুকে একত্র করিয়া এক একটি হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অণুর রচনা করিয়াছিল, বিদ্যুৎপ্রবাহ সেই শক্তিরই উপর জয়লাভ করিয়া আবদ্ধ পরমাণুগুলিকে মুক্ত করিয়া দেয় এবং তার পর মুক্ত পরমাণুগুলি নিজেদের পথ নিজেরাই খুঁজিয়া লইয়া সেই বৈদ্যুতিক তারের এক এক প্রান্তে আসিয়া সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের কোটি কোটি অণু এই প্রকারে কোটি কোটি পরমাণুতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নির্দ্দিষ্ট তারের দিকে যাইবার জন্য ছুটাছুটি করিতে থাকিলেও জলে এই ছুটাছুটির কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। এসিড-মিশ্রিত জলটা ঠিক্ পূর্ব্বের ন্যায়ই নিশ্চল ও অচঞ্চল অবস্থাতেই রহিয়া যায়।

* পাঠক অবশ্যই জানেন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ এক প্রকার যৌগিক পদার্থ। এক পরমাণু হাইড্রোজেন এবং আর এক পরমাণু ক্লোরিন্ মিলিয়া ঐ এসিডের এক একটি অণুর রচনা করে।

বৈদ্যুতিক শক্তি কি প্রকারে রাসায়নিক শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে, এবং যে পদার্থের ভিতর দিয়া নানা বাষ্পকণার এত ছুটাছুটি, তাহাই বা কেন অচঞ্চল থাকে, এখন এই দুটি প্রশ্নের মীমাংসা করা যাউক।

কোন নূতন প্রাকৃতিক ব্যাপার আবিষ্কৃত হইলে, কোন কালেই তাহার ব্যাখ্যানের অভাব হয় না। জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যুগে যুগে এই প্রকারে যে, কত প্রাকৃতিক ব্যাপারের কত ব্যাখ্যান দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু আধুনিক যুগে কঠোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাহাদের প্রায় সকলকেই পরাহত হইতে হইয়াছে। বিদ্যুতের বিশ্লেষণী শক্তির অস্তিত্ব প্রকাশ হওয়ার পর নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কারণ স্থির করিবার জন্য গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং অল্পদিন মধ্যে তিন চারি প্রকারের ব্যাখ্যান প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাহাদের প্রায় সকলগুলিতেই নানাপ্রকার ভুল ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আজকাল কেবল ক্লসিয়স্ (Clausius) সাহেবের সিদ্ধান্তটিই (Electrolytic Dissociation Theory) পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের নির্ভুল ব্যাখ্যান বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন, জল ও হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ একসঙ্গে মিশাইলে. উভয়ের অণু বুঝি অবিকৃত থাকিয়াই পাশাপাশি বিচরণ করে। ফ্যারাডে ও তাঁহার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকার একটা বিশ্বাসকে মনে রাখিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজেই, ইঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। ক্লসিয়স্ সাহেব ঐসকল প্রাচীন সংস্কারকে মনে স্থান না দিয়া সত্যানুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে দেখিয়াছিলেন, হাইড্রোক্লোরিক্ মিশ্রিত জলে এসিড্ ও জলের অণু কোনপ্রকারে অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে না। জলে এসিড ঢালিবামাত্র তাহার অণুগুলি আপনা হইতেই

বিশ্লিষ্ট হইয়া অসংখ্য হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের পরমাণুতে পরিণত হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের পরমাণুগুলি আপনা হইতেই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া যায়। উপমার সাহায্য লইলে বলিতে পারা যায়, সাধারণ জলে হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ মিশিবামাত্র তাহার ক্লোরিন ও হাইড্রোজেনের পরমাণুগুলি বন্ধনমুক্ত হইয়া ছোট ছোট নৌকার মত জলে ভাসিয়া উঠে। হাইড্রোজেনের নৌকায় ধনাত্মক বিদ্যুৎ বোঝাই থাকে, এবং ক্লোরিনের নৌকায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎ থাকে।

অতি-সংকীর্ণ খালের ভিতর এতগুলা নৌকা ভাসিতে থাকিলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষণ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। ক্লসিয়স্ সাহেব বলেন, জলমিশ্রিত পদার্থে এপ্রকার পারমাণবিক সংঘর্ষণ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বিপরীতজাতীয় বিদ্যুৎ-বোঝাই দুখানা নৌকা যখন খুব কাছাকাছি আসিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দেয়, তখন তাহারা আবার সেই পূর্ব্বেকার হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের অণুতে পরিণত হইয়া ডুবিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই প্রকার সংযোগ বিয়োগ অধিকাংশ জলমিশ্র পদার্থে অবিরাম চলিয়া থাকে। ধনাত্মকও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-বোঝাই জোড়া জোড়া নৌকা যেমন একদিকে ডুবিযা যায়, অপর দিকে তেমনি জোড়া জোড়া নূতন নৌকা ভাসিয়া উঠিয়া সেই ক্ষয়ের পূরণ করে।

ক্লসিয়স্ সাহেবের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ যে, পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহা শত শত পরীক্ষায় নিশ্চয়রূপে জানা গিয়াছে, এবং একই জাতীয় বিদ্যুৎ যে, পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং যখন হাইড্রো-ক্লোরিক্ এসিডের জলে ব্যাটারির তার নিমজ্জিত করা যায়, তখন তারের যে প্রান্তটি ঋণাত্মক তড়িতে পূর্ণ (Kathode) তাহাতে যে, ধনাত্মক

বিদ্যুৎযুক্ত হাইড্রোজেন তরণীগুলি আসিয়া ঠেকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

বক্তব্য বিষয়টিকে সহজ করিবার জন্য আমরা এপর্য্যন্ত এক হাইড্রোক্লোরিক এসিডের কার্য্য লইয়াই আলোচনা করিতেছিলাম। শত শত পরীক্ষায় স্থির হইয়া গিয়াছে, কেবল হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড নয়, অধিকাংশ যৌগিক পদার্থকেই জলে মিশাইলে তাহাদের অণুগুলি ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্বিধা হইয়া পড়ে, এবং এক ভাগে ধনাত্মক এবং অপর ভাগে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ফ্যারাডে, ডেভি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎ ও রসায়নের কার্য্যের মধ্যে যে সম্বন্ধটি খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহাদের জীবন অবসান করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট আপনা হইতেই ধরা দিয়াছে। রাসায়নিক কার্য্যেরও একটা কিনারা এই আবিষ্কারের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চিনি প্রভৃতি কতকগুলি জৈবপদার্থের রাসায়নিক কার্য্য অত্যন্ত অল্প। ইহাদের অণুগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া মৌলিক পরমাণুতে পরিণত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। জলে মিশাইলেও ইহাদের অণু বিভক্ত হইয়া ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ বহন করে না। কিন্তু এসিড, ক্ষার প্রভৃতি সক্রিয় জিনিষগুলাকে জলে ফেলিবামাত্র তাহাদের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া বিদ্যুৎ-যুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং জলস্পর্শে ভাঙ্গিয়া গিয়া বিদ্যুৎ-পূর্ণ হওয়াই যে, রাসায়নিক কার্য্যের একটা গোড়ার কারণ, তাহা আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি।

আধুনিক রাসায়নবিৎ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত অণুবিভাগ অবলম্বন করিয়াই আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ডাল্‌টন্ সাহেব অণু পরমাণুর অস্তিত্বমাত্র প্রমাণ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ শক্তিতে পরমাণু মিলিয়া অণু হয়, এবং কোন্ শক্তিতেই বা অণু

বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার পরমাণুতে পরিণত হয়, তাহার সন্ধান তিনি দিতে পারেন নাই। জলমিশ্রিত অণু দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া বিদ্যুদ্‌যুক্ত হইতেছে দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেই রাসায়নিক শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু অণুর বিভাগ হয় কেন, এবং বিদ্যুতের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হয়, এ সকল গোড়ার খবর আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। আজকাল রেডিয়ম (Radium) প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের তেজ নির্গমন ও সক্রিয়তা লইয়া যেপ্রকার গবেষণা চলিতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, রাসায়নিক শক্তির আরো গোড়ার খবর শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে।

———

ইলেক্ট্রন্

তিনশত বৎসর পূর্ব্বে গিল্বার্ট সাহেব ও তাহার অনেক পরে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিন্ বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক জিনিষেই ধনাত্মক (Positive) ও ঋণাত্মক (Negative) নামক দুই প্রকার বিদ্যুৎ আছে। যে জিনিষে ধনাত্মক বিদ্যুতের আধিক্য থাকে, তাহাকে আমরা ধনাত্মক বিদ্যুৎপূর্ণ বলি এবং যাহাতে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহাকে ঋণাত্মক বিদ্যুৎপূর্ণ বলিয়া থাকি। এই জাতীয় বিদ্যুতের পরিমাণ কোন জিনিষে সমান থাকিলে, তাহাতে আর বিদ্যুতের লক্ষণ দেখা যায় না, কারণ তখন ধনাত্মক বিদ্যুৎ সমপরিমাণ ঋণাত্মককে টানিয়া রাখে।

ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল্ বলিয়াছিলেন, —জলের যেমন নিজের কোন শক্তি নাই, বিদ্যুতেরও সেইপ্রকার কোন শক্তি নাই। জল উঁচুস্থানে রাখিলে বা তাহাতে সবলে চাপাদি দিলে, তাহা দ্বারা যেমন অনেক কাজ করাইয়া লওয়া যায়, বিদ্যুৎকেও আমরা সেইপ্রকারে চালাইয়া কাজ করাইয়া লইয়া থাকি। আমরা তাপ আলোক উৎপন্ন করিবার উপায় জানি, কিন্তু ম্যাক্সওয়েল্ বলিয়াছিলেন,—বিদ্যুৎ প্রস্তুত করিবার উপায় আমরা জানি না। এই জিনিষটা প্রস্তুতই আছে, তাহাকে কোনপ্রকারে গতিসম্পন্ন করিতে পারিলেই, আমরা তাহার কাজ দেখিতে পাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যখন সল্ফিউরিক এসিডে তাম্র ও দস্তার পাত ডুবানো যায়, তখন বিদ্যুৎ প্রস্তুত হয় না, স্বাভাবিক বিদ্যুৎকে সচল করানো হয় মাত্র।

আজ ত্রিশবৎসর ধরিয়া ম্যাক্সওয়েলের শিষ্যগণ বিদ্যুতের পূর্ব্বোক্ত মতবাদটি প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ জিনিষটা

যে কি, তাহা এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পরিষ্কার জানা যাইত না। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইঁহারা বলিতেন,—সম্ভবতঃ জড়েরই কোন বিশেষ আকার বা ধর্ম্মকে আমরা বিদ্যুৎরূপে দেখি।

এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ ম্যাক্সওয়েলের সিদ্ধান্তটিই নাড়াচাড়া করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি যে নূতন মতবাদের কথা শুনা যাইতেছে, তাহাতে উহার সত্যতায় ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। এই নবসিদ্ধান্তিগণের মতে বিদ্যুৎ জড়ের বিশেষ আকার বা ধর্ম্মের বিকাশ নয়; বিদ্যুৎই অবস্থাবিশেষে পড়িয়া জড়ের উৎপত্তি করে।

নূতন সিদ্ধান্তটি বুঝিতে হইলে, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ কি, তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। ধনাত্মক বিদ্যুতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সিদ্ধান্তিগণ বলেন,—জিনিষটার খুঁটিনাটি আজও ঠিক জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা যে সর্ব্বব্যাপী ঈথরের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেরই বিশেষ গুণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অংশগুলির আয়তন সাধারণ পরমাণু (Atoms) অপেক্ষা বৃহত্তর নয়, কিন্তু পরমাণুমাত্রেরই যেপ্রকার গুরুত্ব দেখা যায়, ধনাত্মক বিদ্যুতের সেপ্রকার গুরুত্বের আজও কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অধ্যাপক টম্‌সন্, রদারফোর্ড, সার্ অলিভার লজ্ প্রভৃতি আধুনিক বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

অতি অল্পদিনমধ্যে ঋণাত্মক বিদ্যুতের অনেক তথ্য জানা গিয়াছে। এই জিনিষটা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জড় জড়কণার আকারে অবস্থান করে। বৈজ্ঞানিকগণ এগুলিকে ইলেক্ট্রন্ (Electron) নামে অভিহিত করিতেছেন। বায়ুশূন্য পাত্রের দুই প্রান্তে তার লাগাইয়া বিদ্যুৎ চালাইলে, প্রবাহের সহিত ইলেক্ট্রনগুলিকে অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে দেখা যায়,

এবং এই প্রবাহ কোনপ্রকারে অবরুদ্ধ হইলে, প্রবাহস্থ কোটি কোটি ক্ষুদ্র ইলেক্ট্রনের আঘাতে অবরোধক জিনিষটা উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এবং শেষে তাহা হইতে একপ্রকার আলোকও বাহির হইতে দেখা যায়। রন্‌জেন্‌রশ্মি বা x-Rays কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, প্লাটিনম্ প্রভৃতি গুরুভারবিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা ইলেক্ট্রনের প্রবাহ অবরুদ্ধ হইলে ঐ রশ্মির উৎপত্তি হয়। লক্ষ লক্ষ ইলেক্ট্রন্ দ্রুতগতিতে আসিয়া ধাক্কা দিতে থাকিলে, প্লাটিনমের অণুগুলি চঞ্চল হইয়া পার্শ্বের ঈথরকণা-সকলকে কাঁপাইয়া তুলে। এই কম্পনজাত আলোকই রন্‌জেন্‌রশ্মি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইলেক্ট্রনের আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র। একটি পরমাণু যে অতি ক্ষুদ্র স্থান অবরোধ করে, তাহার মধ্যে কোটি কোটি ইলেক্ট্রন্ অনায়াসে চলাফেরা করিতে পারে। এইজন্য ঐ অতি ক্ষুদ্র কণাগুলির প্রবাহ যে-কোন পদার্থ দ্বারা অবরুদ্ধ হয় না। আলুমিনিয়ম্ প্রভৃতি লঘু ধাতুর ফলক ইলেক্ট্রন্‌প্রবাহের পথে ধরিলে, চালুনির ছিদ্র দিয়া ময়দার গুঁড়া বাহির হওয়ার মত অধিকাংশ ইলেক্ট্রন্‌ই অবাধে বাহির হইয়া পড়ে।

লৌহখণ্ডের নিকট চুম্বক রাখিলে লৌহ আপনা হইতেই চুম্বকের নিকটে আসে। ইলেক্ট্রনের প্রবাহের সম্প্রতি ঐপ্রকার একটা গুণ দেখা গিয়াছে। বায়ুহীন নলের ভিতরকার ইলেক্ট্রন্‌প্রবাহের নিকট একখণ্ড চুম্বক রাখ,—প্রবাহের পথ বাঁকিয়া চুম্বকের নিকটে আসিবে। কতখানি চৌম্বকশক্তিতে প্রবাহের পথ কতটা বাঁকিয়া যায়, হিসাব করিয়া কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ইলেক্ট্রন্‌সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহাদের পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, ইলেক্ট্রন্‌গুলি এত লঘু জিনিষ যে, তাহাদের আটশতটির ভার একটি হাইড্রোজেন্-পরমাণুর ভারের সমান।

ধাতু ইত্যাদি পরিচালক পদার্থের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ কিপ্রকারে চলাফেরা করে, বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত তাহা নিশ্চিত বলিতে পারিতেন না। আজকাল ইলেক্ট্রন্ লইয়া বিদ্যুৎপরিচালনের যে একটি ব্যাখান দেওয়া হইতেছে, তাহা অনেকটা নিশ্চিতের দিকে অগ্রসর করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অধ্যাপক টমসন্, লজ্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন—তারের ভিতর দিয়া যখন বিদ্যুৎ যায়, সেই সময় বিদ্যুৎ-ময় ছোট ছোট ইলেক্ট্রন্গুলি ধাতু নির্ম্মিত তারের অণুগুলিতে তাহাদের বিদ্যুৎ ঢালিয়া দেয় এবং পরে তাহারাই আবার পার্শ্বস্থ অণুতে সেই বিদ্যুৎ চালাইয়া এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের উৎপত্তি করে। অধ্যাপক লজ্ তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—দূরস্থান হইতে ইষ্টকাদি বহিয়া আনিতে হইলে শ্রমজীবীরা সার দিয়া দাঁড়াইয়া যেমন একের স্কন্ধ হইতে অপরের স্কন্ধে ইষ্টক চালান দেয়, ধাতুর ভিতরকার শ্রেণীবদ্ধ অণুগুলিও সেই প্রকারে বিদ্যুৎ পরিচালন করিয়া থাকে।

তরলপদার্থে বিদ্যুৎ পরিচালনের ব্যাপারটা কিছু স্বতন্ত্র রকমের। ধাতবপদার্থে ইলেক্ট্রন্গুলি যেমন ধাতুর অণুতে বিদ্যুৎ ঢালিয়া দিয়াই মুক্তি পায় এখানে সেপ্রকার হয় না। তরলপদার্থের কোন দুই অংশে ব্যাটারির তার সংলগ্ন রাখিলে, তারের এক প্রান্ত হইতে ইলেক্ট্রন্-প্রবাহ বাহির হইয়া অপর প্রান্তের অভিমুখে ছুটিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্ট্রন্গুলি সেই তরলপদার্থের কতক কতক অণুকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। কোনপ্রকার ভার না চাপাইলে ঘোড়া খুব দৌড়িয়া চলিতে পারে, কিন্তু গুরুভার পৃষ্ঠে পড়িলেই তাহার গতি আপনা হইতেই মন্থর হইয়া আসে। এইপ্রকার কারণে ধাতু বা বায়ুহীন স্থানের বেগের তুলনায় তরল পদার্থের ভিতরকার বিদ্যুতের বেগ অনেক কম হইতে দেখা যায়।

কেম্ব্রিজের বৈজ্ঞানিকগণ আর একটি বিশেষ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহারা দেখিয়াছেন,—ইলেক্ট্রনের গতি বাধা পাইলে পার্শ্বস্থ ঈথর আলোড়িত হইয়া যে একপ্রকার ক্ষুদ্র তরঙ্গের উৎপত্তি করে, তাহাই আলোকাদি বিকিরণের মূল কারণ। আলোক যে, ঈথর-তরঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা আমরা বহুদিন হইতে জানিয়া আসিতেছি, কিন্তু কি-প্রকারে সেই ঈথর-তরঙ্গের উৎপত্তি, তাহা আমাদের জানা ছিল না। এখন বড় বড় বৈজ্ঞানিকমাত্রেই অনুমান করিতেছেন—সম্ভবতঃ ইলেক্ট্রনের গতির আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ঈথরে যে তরঙ্গ জন্মায়, তাহাই আলোকোৎপত্তির একমাত্র কারণ।

রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক জড়পদার্থের অনুসন্ধান করিলে অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, লৌহ, তাম্র ইত্যাদি অনেকগুলি মূল জড়ের উল্লেখ দেখা যায়। বিজ্ঞানের মতে ঐ কয়েকটি মূলপদার্থের সংযোগেই জগতের সকল জিনিষই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত এই প্রাচীন সিদ্ধান্তটির কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কিন্তু ইলেক্ট্রনের আবিষ্কারে ইহারো সত্যতার উপর অনেকের সন্দেহ দেখা যাইতেছে। কয়েকজন খ্যাতনামা আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন,—ইলেক্ট্রন্ই একমাত্র মৌলিক জড়।

নক্ষত্রের গঠনোপাদান

একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন,—"আমরা যে ধূলি পদ-দলিত করিয়া সর্ব্বদা চলাফেরা করিতেছি, তাহা কোন্ কোন্ পদার্থের যোগে উৎপন্ন, তাহা স্থির করিতে যথেষ্ট আয়োজনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু কোটি কোটি মাইল দূরের ছোট-বড় নক্ষত্রের গঠনোপাদন নির্ণয়ের জন্য একটুও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না।"

কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। ক্ষুদ্র ধূলিমুষ্টির গঠনোপাদন নির্ণয় করিবার জন্ত আধুনিক বীক্ষণাগারে যে, কত কাচের নল, কত ছোট-বড যন্ত্র, কত রাসয়ানিক দ্রব্যের ব্যবহার করিতে হয়, তাহা বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই। আয়োজনের একটু ক্রটি এবং সরঞ্জামের একটু অভাব হইলে, আর গঠনোপাদান নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু কোটি কোটি মাইল দূরের যে মহাসূর্য্যগুলিকে আমরা নক্ষত্রের আকারে আকাশে দেখিতে পাই, একটি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের আলোক বিশ্লেষ করিয়া, গঠনোপাদন নির্ণয় করা যায়। কেবল ইহাই নহে, ঐ সকল নক্ষত্রে যে বাষ্প জ্বলিতেছে, সেগুলি স্থির আছে, কি চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, তাহাও ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্র দ্বারা নির্ণয় করা যায়।

নক্ষত্রের গঠনোপাদন-নির্ণয়ের যে প্রক্রিয়া আজ জ্যোতির্বিদ্যাকে এত উন্নত করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায়, সত্তর বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে (১৮৫৯ সালে) প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কারকফ্ (Kirchhoff) এবং বুনসেন (Bunsen) প্রথমে ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। দাম্ভিক মানুষ যখন মনে মনে ভাবিতে থাকে, এই বুঝি আমরা জ্ঞানের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তখন প্রকৃতি দেবী তাঁহার চিররহস্যময় অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া এমন একটি মূর্ত্তি দেখান

যে, তাহা দেখিয়া মানুষ অবাক্ হইয়া যায়। তখন মানুষ বেশ বুঝিতে পারে, তাহার জ্ঞানের পরিধি কত ক্ষুদ্র।

১৮৫৯ সালে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহণের গতিবিধির অতি সূক্ষ্ম গণনা করিতে পারিতেন। কয়েকটি ধূমকেতুর ভ্রমণপথও ইঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং কোন্ সময়ে কোন্ ধূমকেতুর উদয় হইবে তাহাও বলিতে পারিতেন। যে নিয়মের অধীন হইয়া কোন গুরু পদার্থ উপর হইতে ভূতলে পড়ে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া গ্রহ নক্ষত্র সূর্য্য সকলই যে পরিভ্রমণ করিতেছে, প্রাচীন জ্যোতিষিগণ তাহা জানিতেন না; আমাদের ভূমধ্যাকর্ষণই যে একই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাকর্ষণের অঙ্গীভূত, তাহা এই সময়ে জ্যোতিষিগণ বুঝিয়াছিলেন। যুগ্মতারকার (Binary Stars) গতিবিধিতে এবং সূর্য্যের পরিক্রমণে মহাকর্ষণের নিয়ম ধরা পড়িয়াছিল। লাপ্লাসের নীহারিকাবাদে এই সময়ে অনেকে আস্থাবান্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক অত্যুষ্ণ জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হইতেই যে, আমাদের এই সৌরজগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেন। কিন্তু কোন্ কোন্ উপাদানে আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী চন্দ্র, মঙ্গল বা শুক্র প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহগণ গঠিত, তাহা কোন জ্যোতিষীই বলিতে পারিতেন না। এতদ্ব্যতীত গ্রহনক্ষত্রগণের প্রাকৃতিক অবস্থা কি প্রকার এবং তাহাতে জীব বাস করিতে পারে কিনা, এ-সম্বন্ধেও তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায় যে সকল জ্যোতিষ্ককে আমরা এখন নীহারিকা (Nebulæ) বলি, সেই সময়কার জ্যোতিষিগণ তাহা বার বার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সেগুলিকে অতি দূরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা ছিল।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও ফোটোগ্রাফি জ্যোতিঃশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। আমরা নগ্নচক্ষে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তা ছাড়া

যে, কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশে রহিয়াছে, তাহা ঐ দুই যন্ত্রের সাহায্যেই আমরা জানিয়াছি। আজকাল নক্ষত্রের যে সকল মানচিত্র অতি অল্প মূল্যে আমরা পাইতেছি. ফোটোগ্রাফিই সেগুলিকে নিখুঁত করিয়া আঁকিতেছে। কত নক্ষত্রের গতি যে, ফোটোগ্রাফির সাহায্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা হয় না। পূর্ব্বে মাইরা (Mira) অলগল (Algol) প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র নক্ষত্রকে আমরা পরিবর্ত্তনশীল (Variable) বলিয়া জানিতাম, এক ফোটোগ্রাফির প্রসাদে পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের তালিকা সুদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রমণ্ডলেব যে সকল ফোটোগ্রাফ এখন প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে ছোটখাটো পাহাড় ও গুহার পরিচয় পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি খুব সত্য, কিন্তু আলোক বিশ্লেষ করিয়া জ্যোতিষ্কদিগের গঠনোপাদান নির্ণয় করিবার পন্থা আবিষ্কার হওয়ার পর সৃষ্টিতত্ত্বের যে সকল রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বড়ই অদ্ভুত। রশ্মিবিশ্লেষ দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার যে সকল মহারত্ন লাভ করিয়াছে, তাহা সত্যই অতুলনীয়।

যাহা হউক, রশ্মিবিশ্লেষ ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে আলোকতত্ত্বের কতকগুলি গোড়ার কথা মনে রাখা আবশ্যক হইবে।

দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত নিউটন দেখাইয়াছিলেন, সূর্য্যের শুভ্রালোক বা অপর কোন উজ্জ্বল পদার্থের সাদা আলোক তে-শিরা কাচের ভিতর দিয়া চালাইলে তাহা যখন সেই কাচখণ্ডের বাহিরে আসে, তখন, আর শুভ্রালোক থাকে না। রামধনুতে যে সপ্তবর্ণের প্রকাশ দেখা যায়, সেই লোহিত, পীত. হরিৎ ইত্যাদি নানাবর্ণ সেই এক শুভ্রালোক হইতে উৎপন্ন হয়। দেয়ালগিরি বা ঝাড় লণ্ঠনে যে তে-শিরা কাচ ঝুলানো থাকে, তাহা লইয়া কেহ পরীক্ষা করিলেও সাধারণ শুভ্রালোককে ঐ প্রকার বহু বর্ণরশ্মিতে বিশ্লিষ্ট হইতে

প্রত্যক্ষ দেখিবেন। এই পরীক্ষা হইতে নিউটন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সূর্য্য বা অপর কোন পদার্থের সাদা আলোক প্রকৃতই সাদা নয়, তাহা রক্তপীত ও সবুজনীল প্রভৃতি বহু বর্ণরশ্মির সম্মিলনে উৎপন্ন। এই সিদ্ধান্তটি আজও পণ্ডিত-সমাজে গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে।

সঙ্কীর্ণ ফাঁকের ভিতর দিয়া আলোক আনিয়া সেই তে-শিরা কাচের ভিতর দিয়া উহা চালাইতে থাকিলে, যে বর্ণরশ্মি পাওয়া যায়, সে-গুলিকে অতি সুস্পষ্ট দেখা যায়। পর্দ্দার উপরে বা দেওয়ালের গায়ে এই প্রকারে যে নানাবর্ণের আলোক-রশ্মি আসিয়া পড়ে, তাহাকে বৈজ্ঞানিকগণ Spectrum বলেন। আমরা তাহাকে 'বর্ণচ্ছত্র' নামে অভিহিত করিব। সঙ্কীর্ণ ফাঁকের ভিতর দিয়া আগত আলোকের বর্ণচ্ছত্রে রক্ত, পীত, সবুজ, নীল প্রভৃতি প্রত্যেক রশ্মিরই এক একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। বিদ্যুতের আলোক বা গ্যাসের আলোক ঐ প্রকার বিশ্লেষ করিলে, বর্ণচ্ছত্রে সকল বর্ণই পর পর প্রকাশিত দেখা যায়— বর্ণচ্ছত্রে কোন বিচ্ছেদ অর্থাৎ ফাঁকা স্থান থাকে না। সূর্য্যরশ্মির বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিলেও ঐ প্রকার প্রায় অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম পরীক্ষায় মাঝে মাঝে কতকগুলি বর্ণের অভাব সুস্পষ্ট দেখা গিয়া থাকে। বর্ণচ্ছত্রে এই বর্ণরশ্মিহীন স্থানগুলিকে কৃষ্ণ রেখার ন্যায় দেখা যায়। গত শতাব্দীর প্রথমে ওলাষ্টন (Wollaston) এবং ফ্রানহোফার (Fraunhofer) নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক সৌরবর্ণচ্ছত্রে ঐ কৃষ্ণরেখার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আবিষ্কারকের নাম অনুসারে সেগুলি আজও ফ্রানহোফারের রেখা (Fraunhofer's Line) নামে পরিচিত হইতেছে। যাহা হউক, সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে কতকগুলি বর্ণের অভাব আবিষ্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কি কারণে সাধারণ অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র হইতে ঐ বর্ণগুলির লোপ পায়, তাহা সেই সময়ে কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। এই ব্যাপারের ব্যাখ্যানের জন্য

বৈজ্ঞানিকদিগকে অর্দ্ধ শতাব্দী কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

হাইড্রোজেন বাষ্প পুড়িয়া যে ক্ষীণালোক উৎপন্ন করে, তে-শিরা কাচের সাহায্যে তাহার বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিলে দেখা যায়, সূর্য্যালোকের বর্ণচ্ছত্রে যেমন অবিচ্ছেদে সকলগুলি রঙ্‌ পরে পরে প্রকাশ পায়, ইহাতে তাহা থাকে না। স্থানে স্থানে এক একটা রঙের স্থূল রেখা লইয়াই ইহার বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই হাইড্রোজেন বাষ্পে যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করিয়া পোড়াইতে থাকিলে ঐ স্থূল রেখাময় বর্ণচ্ছত্রই ক্রমে পাশাপাশি বাড়িয়া সৌরবর্ণচ্ছত্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। সৌববর্ণচ্ছত্রের মাঝে মাঝে কেন বর্ণহীন কৃষ্ণরেখার উৎপত্তি হয়, এই পরীক্ষা হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সোডিয়ম নামক ধাতু বা সেই ধাতুঘটিত কোন পদার্থ পোড়াইলে যে আলোক হয়, তাহার বর্ণচ্ছত্রে রক্ত, নীল, সবুজ প্রভৃতি কোন রঙের প্রকাশ থাকে না, কেবল বর্ণচ্ছত্রের পীত রঙের স্থানে দুইটি উজ্জ্বল পীত রেখা দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিকগণ এই বর্ণচ্ছত্রের সহিত সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র তুলনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, সৌরবর্ণচ্ছত্রের যে অংশে দুইটি কৃষ্ণ চিহ্ন আছে, সোডিয়মের বর্ণচ্ছত্রের ঠিক সেই অংশেই এ দুইটি উজ্জ্বল পীত রেখা রহিয়াছে। কাজেই, সৌরবর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণরেখার সহিত সোডিয়মের উজ্জ্বল রেখার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার কথা অনেকরই মনে আসিয়াছিল।

গত ১৮৫৯ সালে কারকফ্‌ ও বুনসেন সাধারণ বিদ্যুতের আলোকের বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য, ইহাতে রক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বেগুনিয়া পর্য্যন্ত রামধনুর সকল বর্ণই সুবিন্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। আবিষ্কারকদ্বয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ আলোকের পথে সোডিয়মের অনুজ্জ্বল বাষ্প রাখিয়া বর্ণচ্ছত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয়

কি না, দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, সোডিয়মের বর্ণচ্ছত্রে যে দুইটি স্থূল পীত রেখা প্রকাশ পায়, বিদ্যুতালোকের মাঝে সোডিয়ম বাষ্প রাখায় উহার সেই অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রে ঐ পীত রেখাদ্বয় প্রকাশ পায় নাই। অর্থাৎ বিদ্যুতালোকের অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র কেবল সোডিয়ম বাষ্প দ্বারা খণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই পরীক্ষার ফলে সৌরবর্ণচ্ছত্রে কেন কতকগুলি বর্ণবর্জ্জিত স্থান থাকে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা বুঝিতে পরিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, কোন বাষ্প পুড়িয়া যে বর্ণরেখা উৎপন্ন করে, সাধারণ অনুজ্জ্বল অবস্থায় তাহাই অপর অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রের সেই সকল বর্ণরেখাগুলিকে হরণ করিতে পারে।

একটা উদাহরণ দ্বারা বিষয়টা বুঝান যাউক। ম্যাগনিসিয়ম্ ধাতুর বাষ্প পোড়াইতে থাকিলে তাহার আলোক হইতে যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহাতে রক্ত পীতাদি কোন বর্ণই দেখা যায় না। নীল ও সবুজের কয়েকটি উজ্জ্বল রেখা লইয়াই ইহার বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ পায়। সাধারণ বিদ্যুতালোকের বিশ্লেষে যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহাতে একটি বর্ণেরও অভাব থাকে না. রক্তপীত সবুজনীল প্রভৃতি সকল বর্ণই ইহাতে পর পর সুসজ্জিত থাকে। এখন বিদ্যুতালোকের পথে যদি ম্যাগ্‌নিসিয়ম্ বাষ্প রাখা যায়. তবে দর্শক আর বিদ্যুতালোকের বর্ণচ্ছত্রকে অখণ্ড দেখিতে পাইবেন না। ম্যাগ্‌নিসিয়ম্ নিজে পুড়িবার সময় নীল ও সবুজে যে আলোক-রেখা উৎপন্ন করিতে পারিত, বিদ্যুতের অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র হইতে উহা সেই কয়েকটি বর্ণ হরণ করিয়া লইবে। কাজেই, মাঝে ম্যাগ্‌নিসিয়ম্ বাষ্প রাখায় বিদ্যুতালোকের বর্ণচ্ছত্র সৌর বর্ণচ্ছত্রের ন্যায় কয়েকটি কৃষ্ণরেখাযুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইবে।

কঠিন ও তরল পদার্থ উজ্জ্বল হইলে যে আলোক প্রদান করে, তাহা হইতে অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়। প্রবল চাপ প্রয়োগের পর বাষ্প

জ্বালাইতে থাকিলেও অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র দেখা যায়। কিন্তু সাধারণ বাষ্প প্রজ্বলিত হইয়া কখনই অখণ্ড বর্ণচ্ছত্রের প্রকাশ করে না। বাষ্পমাত্রেরই বর্ণচ্ছত্র স্থূল রেখাময় হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং যখন কোনও কঠিন পদার্থ বা চাপপ্রাপ্ত বায়বীয় বস্তু উজ্জ্বল হইয়া কৃষ্ণরেখাযুক্ত খণ্ডিত বর্ণচ্ছত্র দেখাইতে থাকে, তখন পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, কঠিন বা চাপপ্রাপ্ত বায়বীয় পদার্থ নিশ্চয়ই কোন বাষ্পের আবরণে আবৃত আছে এবং এই শীতল বাষ্পাবরণই কতকগুলি বর্ণরশ্মিকে হরণ করিয়া বর্ণচ্ছত্রকে খণ্ডিত করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্, অঙ্গার এবং প্রত্যেক ধাতু প্রভৃতি মূল পদার্থের বাষ্প উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে থাকিলে, উহাদের বর্ণচ্ছত্রে কতকগুলি স্থূল বর্ণ রেখা প্রকাশ পায়। কাজেই, কেবল বর্ণচ্ছত্র দেখিলেই বলা যাইতে পারে যে, উহা কোন্ পদার্থের বর্ণচ্ছত্র। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে, কোন আলোকের পথে যদি শীতল বাষ্প রাখা যায়, তাহা হইলে উহা আলোক হইতে কতকগুলি বর্ণরশ্মি হরণ করিয়া ফেলে। এই হরণ ব্যাপারের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে. ঐ বাষ্প উজ্জ্বল হইলে বর্ণচ্ছত্রে যে সকল বর্ণরেখা দেখাইত, বাছিয়া বাছিয়া উহা সেই সকল রশ্মিকে হরণ করে। সুতরাং যে দ্রব্য উজ্জ্বল হইলে অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ করে, তাহা বাষ্পাবৃত হইয়া কোন্ কোন্ বর্ণের লোপে খণ্ডিত হইতেছে, তাহা ঠিক করিতে পারিলে, কোন্ কোন্ বাষ্প দ্রব্যটিকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা অনায়াসেই নির্ণয় করা যায়।

সূর্য্যালোকের যে বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহাতে পীতবর্ণের স্থানে কয়েকটি কৃষ্ণরেখা দেখা যায়। কিন্তু আমাদের জানা আছে যে, সোডিয়ম্ বা তাহার বাষ্প উজ্জ্বল হইলেই ইহার নিজের বর্ণচ্ছত্রে কয়েকটি পীত রেখামাত্র দেখায়। কাজেই, সূর্য্যের অখণ্ড বর্ণচ্ছত্রে সেই পীত

রেখাগুলির অভাব দেখিলেই অনায়াসে বলা চলে যে, সূর্য্যের দেহ তরলই হোক, বা কঠিনই হউক, ইহার চারিদিকে নিশ্চয়ই সোডিয়মের বাষ্পের আবরণ আছে এবং এই শীতল সোডিয়মের বাষ্পই সূর্য্যের অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র হইতে পীতের রেখাগুলিকে হরণ করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অখণ্ড বর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণরেখাগুলির অবস্থান মিলাইয়া, কোন্ কোন্ বাষ্প উজ্জ্বল পদার্থকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা আজকাল অনায়াসেই নির্ণীত হইতেছে। এই প্রকারে সৌরমণ্ডলে সোডিয়ম্ ব্যতীত লৌহ, হাইড্রোজেন্, ক্যাল্সিয়ম্, ম্যাগ্নিসিয়ম্, পটাসিয়ম্ প্রভৃতি আমাদের সুপরিচিত অনেক মূল পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কেবল সূর্য্য নয়, অতিদূরবর্ত্তী নক্ষত্র, যাহাদের আলোক পৃথিবীতে পৌছিতে সহস্র বৎসর অতিবাহন করে, সেগুলিরও গঠনোপাদান তাহাদের বর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণরেখার স্থান পরীক্ষা করিয়া জানা যাইতেছে। আমাদের পরিজ্ঞাত অনেক পদার্থের অস্তিত্ব এই সকল দূর জ্যোতিষ্কেও ধরা পড়িতেছে। আবার কোন কোন নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্রে এমন কতকগুলি রেখা দেখা যাইতেছে যে, সেগুলি কোন্ পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই এই সকল পদার্থ আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীতে নাই।

ক্লোরিন্, ব্রোমিন্, গন্ধক এবং অক্সিজেন্ এই পদার্থগুলি আমাদের পৃথিবীর অনেক জিনিষেই মিশ্রিত আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে এগুলির চিহ্ন দেখা যায় না। এই ব্যাপারটি জ্যোতিষিগণের নিকট একটা প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সূর্য্য হইতেই পৃথিবীর জন্ম, কাজেই যে সকল উপাদানে পৃথিবীর দেহ নির্ম্মিত, সৌরদেহে সেগুলির অস্তিত্ব থাকারই সম্ভাবনা। সার্ নরমান্ লকিয়ার্ (Lockyer)-প্রমুখ আধুনিক জ্যোতিষিগণ

বলিতেছেন,—গন্ধক ক্লোরিন্ ব্রোমিন্ প্রভৃতি সকল মূলপদার্থই সূর্য্যে আছে কিন্তু সূর্য্যের উষ্ণতায় সেগুলি এমন রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা আর নিজেদের বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ করিতে পারে না। মূল পদার্থের রূপান্তর নাই, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপে ঐ মূলপদার্থ-গুলির রূপান্তরের প্রমাণ পাইয়া অনেকে ঐগুলির মৌলিকতায় সন্দিহান হইয়া পড়িতেছেন।

যাহা হউক, কেবল তে-শিরা কাচের সাহায্যে সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির আলোকের বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিয়া জ্যোতিষ্কের গঠনোপাদান সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আজকাল আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। রশ্মিবিশ্লেষণের এই সহজ প্রক্রিয়াটি আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রকে যে কত উন্নত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না।

আমরা প্রবন্ধান্তরে রশ্মিবিশ্লেষণলব্ধ অপর আবিষ্কারগুলির পরিচয় দিব

সৌরকলঙ্ক

আকাশের অনন্ত জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে একক চন্দ্রই কলঙ্কী বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ। কাজেই, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের সবিতা ভাস্করও যে কলঙ্ক-কালিমা হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন, এ-কথাটা আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। সঙ্কুচিত হইবারই ত কথা,—যাঁহার জ্যোতিতে সমগ্র বিশ্ব জ্যোতিষ্মান্ হইয়া পড়ে সেই জ্যোতির্ম্ময় গ্রহরাজই যে, স্বীয় অঙ্কে অন্ধকারকে পোষণ করিবেন, এটা বড় অদ্ভুত শুনায়। কিন্তু জ্যোতির্বিদগণের কথা বিশ্বাস করিলে সূর্য্যের কলঙ্ক-কালিমায় আর অবিশ্বাস করা চলে না। প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, সৌরদেহ ঠিক্ চন্দ্রের ন্যায়ই কলঙ্কলিপ্ত। এই দুই কলঙ্কের মধ্যে পার্থক্য এই যে, চান্দ্রকলঙ্ক যেমন চিরস্থির, সৌরকলঙ্ক সে-প্রকার নয়। আজ সূর্য্যমণ্ডলের যে অংশে যতটা স্থান ব্যাপিয়া কলঙ্ক দেখা যাইতেছে, কয়েক দিন পরে কলঙ্কটিকে আর সেস্থানে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইবে না। সেটি কখন কখন বৃহৎ এবং কখন ক্ষুদ্রাবয়বসম্পন্ন হইয়া, কয়েক সপ্তাহ সৌরদেহের নানা স্থানে বিচরণ করিতে করিতে শেষে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং আবার হয়ত সৌরদেহের আর এক অংশে এক নূতন কলঙ্কের বিকাশ দেখা যাইবে।

চান্দ্র ও সৌর কলঙ্কের আকারেও কোন সাদৃশ্য নাই। পাঠক চন্দ্র-মণ্ডলের স্থূল রেখাময় দীর্ঘ কলঙ্কচিহ্নগুলি অবশ্যই দেখিয়াছেন। সৌর-কলঙ্ক কোন অংশে সে প্রকার নয়। দূরবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে এগুলিকে সৌরকলেবরের নানা অংশে গোলাকার কৃষ্ণচিহ্নবৎ দেখায়। চন্দ্রের কলঙ্করেখাগুলি যেমন পরস্পর সংলিপ্তভাবে থাকে, সূর্য্যের কলঙ্ক সে-প্রকার পরস্পর সম্বদ্ধ থাকে না,—ইহাদিগকে প্রায়ই সৌরগোলকের

নানা অংশে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যায়। সাধারণ সৌরকলঙ্কগুলির আয়তন বিশাল সৌরদেহের তুলনায় খুব ক্ষুদ্র হইলেও, পৃথিবীর তুলনায় সেগুলি অত্যন্ত বৃহৎ। গণনা দ্বারা জানা গিয়াছে, কোন কোন সৌরকলঙ্কের অধিকৃত স্থান কখন কখন সসাগরা পৃথিবীর চারি পাঁচগুণ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। কয়েকটি কলঙ্কের স্থান, চল্লিশ হাজার বর্গ মাইল অপেক্ষাও অধিক হইতে দেখা গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যমণ্ডলের ঐ প্রকার একটি কলঙ্ক দৃষ্ট হইয়াছিল, এটি এত বৃহৎ যে ইহার পর্য্যবেক্ষণের জন্য দূরবীণেরও আবশ্যক হয় নাই। আমরা কয়েকজন বন্ধু কাচখণ্ডে দীপশিখার কালী মাখাইয়া, কেবল সেই কজ্জললিপ্ত কাচখণ্ড দ্বারা নবোদিত কলঙ্কটিকে দেখিয়াছিলাম।

চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণাদি জ্যোতিষিক ব্যাপার গণনা দ্বারা যেমন পূর্ব্বেই ঠিক্ রাখা যায়, সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব-তিরোভাবের কাল, সে-প্রকার গণনায় জানিবার কোন উপায় আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবিষ্কার করাও অসম্ভব। বৎসরের মধ্যে কোন্ দিন কোন্ স্থানে ঝড়-বৃষ্টি হইবে বলা যেমন অসম্ভব, সূর্য্যমণ্ডলে সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব-কাল স্থির করাও ঠিক্ সেই প্রকার অসম্ভব। ঝড়বৃষ্টি স্থানীয় শীতাতপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, উদ্দাম প্রকৃতি কখন্ কোন্‌টিকে কমাইয়া কোন্‌টিকে বাড়াইবেন, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। সৌরকলঙ্কের উৎপত্তিও তদ্রূপ। স্থানীয় প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বলিয়া, ইহাতে আর গণনা চলে না।

সৌর কলঙ্কের আবির্ভাব-তিরোভাবকালের কোন স্থিরতা নাই বটে, কিন্তু জ্যোতিবিগণ বহু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কলঙ্ক-প্রাচুর্য্যের একটা নিয়ম পাইয়াছেন। প্রায়ই প্রতি এগার বৎসর অন্তর সৌরদেহে প্রচুর কলঙ্কের বিকাশ দেখা যায়, কিন্তু এই এগার বৎসরের সহিত সৌরকলঙ্কের যে কি সম্বন্ধ, তাহা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৬৩৭

খৃষ্টাব্দে সৌরমণ্ডলে এত কলঙ্কের উৎপত্তি দেখা গিয়াছিল যে, তদ্দ্বারা সূর্য্যের তাপালোকের অল্পতা অনেকেই অনুভব করিয়াছিলেন। আবার এপ্রকার সময়ও অনেক দেখা যায়, যখন একবৎসরের মধ্যেও কলঙ্ক একবারও সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বলা বাহুল্য, সূর্য্যের এই নিষ্কলঙ্ক অবস্থা প্রায়ই কলঙ্ক-প্রাচুর্য্যকালের অবকাশের (এগার বৎসরের) মধ্যভাগেই হইয়া থাকে।

এখন সৌরকলঙ্কের উৎপত্তি-তত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। প্রাচীন জ্যোতিষিক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে এসম্বন্ধে অনেক আজগবি কথা শুনা যায়। একজন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—সৌরকলঙ্ক বাস্তবিকপক্ষে সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত নয়; কতকগুলি গ্রহ পরিভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, সৌরালোক অবরুদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া, সূর্য্যের অঙ্গে কৃষ্ণচিহ্নের বিকাশ দেখা যায়। উজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে একটি পত্র ধরিয়া, সেই পত্রের অন্তরাল হইতে কুণ্ড পরীক্ষা করিলে যেমন উহার পত্রাচ্ছাদিত অংশ অনুজ্জ্বল দেখায়, সেই প্রকার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহগুলির দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলে, তাহার উজ্জ্বল অঙ্গে কৃষ্ণচিহ্ন ফুঠিয়া উঠে, প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্ত্রে এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। একদল জ্যোতিষী স্থির করিয়াছিলেন, সৌরাকাশে ভাসমান কৃষ্ণমেঘই সৌরকলঙ্ক। অপর একদল এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—অত্যুজ্জ্বল দ্রব ধাতুময় সৌরসাগরের অংশবিশেষ যখন শীতল হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়, তখন সেই অনুজ্জ্বল জমাট অংশকেই আমরা সৌরকলঙ্কাকারে দেখি। বলা বাহুল্য, আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের কঠোর পরীক্ষায় পূর্ব্বোক্ত মতবাদগুলির প্রত্যেকটিই ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ এ-সম্বন্ধে কি বলেন, এখন দেখা যাউক।

সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধীয় আধুনিক মতবাদ বুঝিতে হইলে, সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থাটার সহিত কিছু পরিচয় থাকা আবশ্যক। হার্সেল (Herschel) ও লাপ্লাস্ (Laplace)-প্রমুখ ভুবনবিখ্যাত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, সূর্য্য সর্ব্বদাই এক বিশাল বাষ্পাবরণে আবৃত হইয়া থাকে সুতরাং ইহার ভিতরের অবস্থাটা যে কি, তাহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখিবার উপায় নাই। প্রকৃত সূর্য্য আজন্ম সেই বাষ্পের অবগুণ্ঠনের ভিতরই লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই বাষ্পাবগুণ্ঠন (Photosphere) পৃথিবীর বাষ্পাবরণের ন্যায় স্বচ্ছ ও জ্যোতির্হীন নয়। ইহা সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত থাকিয়া মহাশূন্যে তাপালোক বিকিরণ করে। সুতরাং সূর্য্যের প্রতাপ তাহার নিজস্ব নয়, বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, কেবল সৌরাকাশই সূর্য্যকে মহিমময় করিয়াছে। কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বল জ্বলন্ত বাষ্পাবরণেই সৌরাকাশের শেষ হয় নাই, উহার উপরে আরও দু'টি নাতিগভীর বাষ্পস্তর পর পর সজ্জিত দেখা গিয়াছে। পর্য্যবেক্ষণ করিলে, বাষ্পাবরণের (Photosphere) প্রখর আলোকে পূর্ব্বোক্ত স্তরদ্বয় খুব উজ্জ্বল দেখায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা তাদৃশ উজ্জ্বল নয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ঐ দুটির মধ্যে নিম্নতর স্তরটি হইতে কেবল এক প্রকার ক্ষীণ লোহিতালোক বাহির হইয়া থাকে, উচ্চতর স্তরটি প্রায় নিষ্প্রভ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রথমোক্ত স্তর বর্ণাবরণ (Chromosphere) এবং দ্বিতীয়টি ছটামুকুট (Corona) নামে আখ্যাত হইয়াছে। অতি বৃহৎ দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল সুকৌশলে পর্য্যবেক্ষণ করিলেও, এই দুইটি স্তরের অস্তিত্ব বড় বুঝা যায় না, কারণ, সূর্য্যপৃষ্ঠসংলগ্ন সেই জ্বলন্ত বাষ্পাবরণের (Photosphere) উজ্জ্বলতায় উপরের সকল স্তরকেই সমান উজ্জ্বল দেখায়। এই জন্য পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকাল বর্ণাবরণ ও ছটামুকুট পর্য্যবেক্ষণের একমাত্র মাহেন্দ্রযোগ। এই সময়ে সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সেই বাষ্পাবরণটাও আবৃত হইয়া

পড়ে, কাজেই তখন বর্ণাবরণ ও ছটামুকুটের নিজেদের উজ্জ্বলতা যে কি প্রকার, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার খুব সুবিধা হইয়া যায়।

আধুনিক পণ্ডিতগণ উক্ত সৌর বাষ্পাবরণের চাঞ্চল্যকেই কলঙ্কের মূলকারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন,—ঐ বাষ্পাবরণটা কোন প্রকারে ছিন্ন হইয়া পড়িলে, যখন প্রকৃত সূর্য্যের অনুজ্জ্বল দেহ উন্মুক্ত হইয়া যায় তখনই আমরা যেই উন্মুক্ত অংশকে কলঙ্কাকারে দেখি। কিন্তু কোন্ মহাশক্তিতে যে, সেই সুগভীর বাষ্পাবরণ ছিন্ন হইয়া যায়, তৎসম্বন্ধে কোন পণ্ডিতই আজও নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। একদল জ্যোতিষী বলিতেছেন যে,—জ্যোতিষ্কের আকাশে এক বিশাল বাষ্পরাশি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া প্রজ্বলিত রহিয়াছে, তাহারা আকাশে যে সর্ব্বদাই স্থির আছে, একথা কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। স্থানীয় তাপের অত্যল্প হ্রাসবৃদ্ধিতে আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীর লঘু বাষ্পময় আকাশে সময়ে সময়ে কি প্রকার ঝটিকাবর্ত্তের উৎপত্তি হয়, তাহা ত আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। সুতরাং সৌরাকাশ যে, আমাদের আকাশের তুলনায় কোটি কোটিগুণ চঞ্চল, তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। জ্যোতিষিগণ এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন,—নানাদিক্ হইতে আগত জ্বলন্ত বাষ্পরাশি পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া, প্রায়ই সৌরাকাশে ঝটিকাবর্ত্তের উৎপত্তি করে, এবং এই সকল আবর্ত্ত সময়ে সময়ে এত প্রবল যে, তদ্দ্বারা আবর্ত্ত-সংলগ্ন স্থানের বাষ্পরাশি স্থানচ্যুত হইয়া যায়। কাজেই, তখন সূর্য্যের অনুজ্জ্বল অংশটা আমাদের চক্ষে পড়ে।

আর একদল পণ্ডিতের মতে শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণের আকর্ষণই সৌরাবরণের চাঞ্চল্যের কারণ।[১] ইঁহারা বলিতেছেন,—ঐ সকল গ্রহ যুগপৎ আকর্ষণ করিয়া বাষ্পাবরণে জোয়ার-ভাটার ন্যায় এক প্রকার ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত করিলে, তাহা দ্বারা বাষ্পাবরণ ছিন্ন-

বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এ-সম্বন্ধে অধ্যাপক বল্‌-প্রমুখ কয়েকজন আধুনিক জ্যোতিষীর মত কিছু স্বতন্ত্র। ইঁহারা বলিতেছেন,—অত্যন্ত তাপ বিকিরণ দ্বারা যখন বাষ্পাবরণের কতক কতক অংশ শীতল হইয়া কিছু ভারী হইয়া পড়ে, তখন সেগুলি আর পার্শ্বস্থ লঘুতর বাষ্পের উপরে ভাসিয়া থাকিতে পারে না, কাজেই ঐ শীতল ও গুরু বাষ্পরাশি ভীম-বেগে সূর্য্যের পৃষ্ঠের দিকে নামিতে থাকে এবং নিম্নস্থ তরল বাষ্প উপরে আসিতে চেষ্টা করে। অধ্যাপক বলের মতে এই প্রকারে উর্দ্ধ ও নিম্নগামী বাষ্পরাশির ঘাত-প্রতিঘাতেই সৌরাকাশের বিচ্ছিন্ন হইবার কারণ। তা ছাড়া যে সকল বাষ্প স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, প্রজ্বলিত হইলে তাহারাই যে অস্বচ্ছ হইয়া পড়ে, তাহা ত আমরা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখিতে পাই। প্রজ্বলিত বাষ্পের এই গুণটিকে অবলম্বন করিয়া বল্‌ সাহেব বলিয়াছিলেন,—জ্বলন্ত অবস্থায় সৌরাবরণের যে অংশ সূর্য্যপৃষ্ঠকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, কিঞ্চিৎ শীতল হইয়া অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িলে যে, তাহারই ভিতর দিয়া আমরা সূর্য্যপৃষ্ঠের দর্শন লাভ করিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

যাহা হউক, সৌর বাষ্পাবরণের বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, খণ্ডিত বাষ্পাবরণই যে, কলঙ্কের উৎপত্তি করে, সে সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই।

সৌরকলঙ্ক-সম্বন্ধে এত বাগবিতণ্ডা ও গবেষণাদি, কেবল কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্যই চলিয়াছিল, বলিয়া পাঠক মনে করিবেন না। এই গবেষণায় সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থাসম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, আমাদের পরিজ্ঞাত জ্যোতিষ্কমাত্রেরই দুই প্রকার গতি আছে। এক গতিতে ইহারা কোনও এক নির্দ্দিষ্ট জ্যোতিষ্কের চারিদিকে ভ্রমণ করে, এবং অপর গতি দ্বারা তাহারা লাটিমের ন্যায়, নিজের অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যও নিজের কোন এক অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরাও বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু সেই গতির পরিমাণ কি, এবং কতদিনেই বা সূর্য্য একবার স্বীয় অক্ষরেখার চারিদিকে পূর্ণাবর্ত্তন সম্পন্ন করে, তাহা তখন জানিবার উপায় ছিল না। সৌর-কলঙ্ক, এ-সম্বন্ধীয় গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সূর্য্যদেহের কোন স্থানে কলঙ্কের উৎপত্তি হইলে, সেটি প্রায়ই সহসা সে স্থান ত্যাগ করে না, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণে কলঙ্কমাত্রকেই সূর্য্যগোলকের একই দিকে গতিসম্পন্ন হইতে দেখা যায়। সুতরাং স্বয়ং সূর্য্যই যে, কলঙ্কগুলিকে লইয়া আবর্ত্তন করে, এই ঘটনা হইতে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া গিয়াছিল, এবং তা'র পর সূর্য্যমণ্ডলের প্রান্তস্থ কলঙ্কের আকস্মিক তিরোভাব ও কয়েকদিন পরে ঠিক্ বিপরীত প্রান্ত হইতে তাহারই উদয়, সূর্য্যের কক্ষাবর্ত্তন গতির অস্তিত্বে খুব বিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিল। কলঙ্কের এই গতি সুদীর্ঘকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির হইয়াছে, পৃথিবী যেমন প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময়ে স্বীয় কক্ষের চারিদিকে এক পূর্ণাবর্ত্তন সম্পন্ন করে, সূর্য্যও ঠিক্ সেই প্রকারে পূর্ব্বপশ্চিমাভিমুখে ঘুরিয়া প্রায় ২৫ দিনে এক পূর্ণাবর্ত্তন শেষ করিয়া থাকে। সূর্য্যের অক্ষরেখার অবস্থান ও উহার বাষ্পাবরণের আনুমানিক গভীরতাও সৌরকলঙ্ক পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সৌরকলঙ্ক যে, সূর্য্যের বাষ্পাবরণেরই কার্য্য, আধুনিক পর্য্যবেক্ষণে সম্প্রতি তাহার আর একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কোন গোলাকার পদার্থ আবর্ত্তিত হইতে থাকিলে তাহার উপরকার প্রত্যেক বিন্দু একই নির্দ্দিষ্ট কালে পূর্ণাবর্ত্তন শেষ করে বলিয়া, গোলকের সকল স্থানের আবর্ত্তনবেগ সমান হয় না,—গোলকের মধ্যস্থান হইতে বিন্দুটি যতই মেরুর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, তাহার আবর্ত্তনবেগও ততই কমিতে আরম্ভ করে। এইজন্য পৃথিবী ও সূর্য্যাদির ন্যায় আবর্ত্তনশীল জ্যোতিষ্কে

বিষুবরেখাস্থ কোন বিন্দুর আবর্ত্তন বেগ, মেরুপ্রদেশস্থ স্থানের আবর্ত্তন-বেগ অপেক্ষা অনেক অধিক দেখা যায়। পাহাড়পর্ব্বত, নদীসমুদ্র জ্যোতিষ্ক-পৃষ্ঠে দৃঢ় সম্বন্ধ থাকে, কাজেই, জ্যোতিষ্কের সহিতই উহাদিগকে নিয়মিত বেগে ঘুরিতে হয়। কিন্তু বাষ্পাবরণের সহিত জ্যোতিষ্ক-পৃষ্ঠের সে-প্রকার কঠিন বন্ধন নাই বলিয়া, উহা সমস্ত বাষ্পাবরণটাকে স্বীয় গতির সহিত টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না। কাজেই, বিষুবরেখার উপরকার ও মেরুসন্নিহিত স্থানের বাষ্পাবরণের আবর্ত্তন-কাল পৃথক্ হওয়াই সম্ভবপর হইয়া দাঁড়ায়। সৌরমণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণে ঠিক তাহাই দেখা গিয়াছে। জ্যোতির্বিদগণ বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী ও মেরুসন্নিহিত নানা কলঙ্কের আবর্ত্তনকাল তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট অনৈক্য দেখিতে পাইয়াছেন। সুতরাং আমরা সূর্য্যের যে অংশ দেখিতে পাই, তাহা যে কেবল বাষ্পময় এবং এই বাষ্পাবরণের খণ্ডনেই যে, কলঙ্কের উদয় হয়, তাহা আর এখন অস্বীকার করা চলে না।

বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি সৌর জ্যোতিষ্কের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটির খুব নিকট সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু সূর্য্যের সহিত ইহার সম্বন্ধটা আরও নিকট। একক সূর্য্যই ত সমগ্র সৌর পরিবারস্থ গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে নানা বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া পরিচালন করিতেছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই বৃহৎ জ্যোতিষ্ক-পরিবারের নিয়ন্তা সূর্য্যের দেহে ঐ প্রকার এক একটা শত যোজনব্যাপী আবর্ত্ত উঠিলে, আমাদের ভূমণ্ডলে কি তাহার কোনও প্রভাব পৌঁছায় না?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কলঙ্ক-প্রাচুর্য্যকালে সূর্য্যকিরণের তীক্ষ্ণতা কিঞ্চিৎ কমিয়া আসে। কিন্তু পৃথিবীর উপর সৌর কলঙ্কের ইহাই একমাত্র প্রভাব নয়। জ্যোতির্বিদগণ বহুকাল হইতে কলঙ্কপ্রাচুর্য্য-কালের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, এই সময়ে

পৃথিবীতে প্রায়ই অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা দৈব উপদ্রবের লক্ষণ দেখা যায়। তা' ছাড়া সেই সময়ে পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির (Magnetism) একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়। পাঠক অবশ্যই জানেন,—দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের চুম্বকশলাকা নিয়তই উত্তর-দক্ষিণাভিমুখে থাকে, এবং তদ্ব্যতীত শলাকার উত্তর প্রান্তটি ভূমির দিকে টানিয়া রাখিবারও একটি শক্তি পৃথিবীর আছে। কলঙ্ক-প্রাচুর্য্যের সময় পৃথিবীর ঐ সকল চৌম্বকশক্তির ভয়ানক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সেই সময় চুম্বকশলাকা এত অধিক বিচলিত হইয়া পড়ে যে, তৎসাহায্যে দিক্ নির্ণয় করাও কখন কখন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

এই চৌম্বক উৎপাতের সহিত সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ কোথায়, পণ্ডিতগণ বহুচেষ্টাতেও এপর্য্যন্ত স্থির করিতে পারেন নাই। ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরেল্ (M. Becquerel) সাহেব কিছুদিন পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্ত প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি বলিতেন,—আমাদের আকাশে যে বিদ্যুৎ দেখা যায় তাহা কেবল পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় না। সূর্য্য যেমন পৃথিবীর সকল শক্তির জনয়িতা, ইহার চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক শক্তির জনকও সেই সূর্য্য। বেকেরেল্ বলেন, সৌরদেহে কলঙ্কের উদয় হইলেই, সেই কলঙ্কাধিকৃত স্থান হইতে ভীমবেগে হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি লঘু বাষ্প বিদ্যুদাত্মক হইয়া মহাশূন্যে ছুটিতে আরম্ভ করে, এবং সেই বিদ্যুদাত্মক হাইড্রোজেনই ক্রমে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া ভূপৃষ্ঠের বিদ্যুৎ ও চৌম্বক উৎপাতের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, বেকেরেলের এই মতবাদটি কেবল অনুমানমূলক বলিয়া, অদ্যাপি কোন পণ্ডিতসমাজই এটিকে গ্রহণ করেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ অধ্যাপক ফেই (Faye) সাহেব, বেকেরেলের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের এক সুতীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং কলঙ্ক-স্থান হইতে হাইড্রোজেন্ বাষ্পের

উদ্গম সম্ভবপর হইলে তাহা যে, কোন ক্রমেই পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না, তাহাও ইনি সেই সময়ে গণিত-সাহায্যে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর উপর সৌরকলঙ্কের প্রভাবের মূলকারণ আবিষ্কারে আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইতেছে। কোন্ শুভদিনে কোন্ বৈজ্ঞানিক যে এই রহস্যের উদ্ভেদ করিয়া ধন্য হইবেন, তাহা এখন বলা অসম্ভব।

আলোকের চাপ

আলোক কোন জিনিষের উপর পড়িলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটার উপরে যে, একটা চাপও আসিয়া পড়ে, এ কথাটি অদ্ভুত শুনাইলেও সম্পূর্ণ সত্য। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে আলোকের উৎপত্তিসম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউটন সাহেবের সিদ্ধান্ত (Corpuscular Theory) প্রচলিত ছিল। ইহাতে বিশ্বাস করিয়া, সেই সময়ে ও তাহার পরবর্ত্তী কালেও বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেন, উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল পদার্থ হইতে আপনা আপনিই এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বাহির হইয়া চারিদিকে ছুটিতে আরম্ভ করে, এবং ঐ অতি সূক্ষ্ম অণুর প্রবাহই আলোক। আলোকের চাপের কথা ঐ প্রাচীন কালে আবিষ্কৃত হইলে কোন বিস্ময়ের কারণ থাকিত না। কারণ, আলোক যখন কোন প্রকার সূক্ষ্ম অণুর প্রবাহ তখন কোন পদার্থের উপর পতিত হইলে সেই প্রবাহের ধাক্কায় তাহাতে যে চাপের উৎপত্তি হইবে, তাহা আমরা অতি সহজেই বুঝিতাম।

গত শতাব্দীর প্রায় মধ্য-কালে ইয়ং ও ফ্রেস্‌নেল (Young, Fresnel) নামক দুই জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন সাহেবের সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইঁহারা উহার ছোট বড় এত ভুল দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাকে আর অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা দায় হইয়া পড়িল। স্থির হইল, ঈথর নামক যে এক সর্ব্বব্যাপী ও সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (Elastic), ভারহীন পদার্থের মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড চলাফেরা করিতেছে, তাহাই আলোকের উৎপাদক। তাপ দ্বারা বা অপর কোন প্রকারে যখন পদার্থের অণুসকল ঘন ঘন কাঁপিতে থাকে, তখন সেই কম্পনের ধাক্কায় ঈথরেও এক প্রকার কম্পনের উৎপত্তি হয়।

ঈথর সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক জিনিষ, কাজেই, একবার কম্পিত হইলে সেই কম্পন ঈথর-সাগরের চারিদিকে তরঙ্গের আকারে ছুটিতে থাকে। ইয়ং ও ফ্রেস্‌নেল সাহেব ঈথরের ঐ তরঙ্গকেই আলোকোৎপত্তির কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। বৈজ্ঞানিক সাধারণ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারিলেন না—নিউটনের সিদ্ধান্তের স্থানে ঈথরীয় সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইল। সেই অবধি আজও সকলে ঈথরের তরঙ্গকেই আলোকোৎপত্তির কারণ বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন।

ঈথরীয় সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা কালে, আলোক-চাপের অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল এবং রেডিয়ম্ (Radium) প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু হইতে যে অবিরাম অণুপ্রবাহ বহির্গত হয়, তাহাও তখন কেহ জানিতেন না। মনে হয়, এই সকল কথা সেই সময়ে জানা থাকিলে ইয়ং ও ফ্রেস্‌নেল্ সাহেব অত সহজে নিউটনের সিদ্ধান্তের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিতেন না।

যাহা হউক, আলোকের চাপ ব্যাপারটা কি, এখন দেখা যাউক। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সওয়েল (Maxwell) সাহেব যখন বিদ্যুৎ ও চৌম্বক শক্তির নূতন তথ্য সকল (Electromagnetic Theory of Light) আবিষ্কারের জন্য নিযুক্ত ছিলেন, ঈথরীয় তরঙ্গ দ্বারা চাপের উৎপত্তির সম্ভাবনা তখন হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িয়াছিল। কিন্তু তখন প্রারব্ধ কার্য্য শেষ করিতে তিনি এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, এই অবান্তর বিষয়টি লইয়া গবেষণার সুবিধা হইয়া উঠিল না। ইহার পর চারি বৎসরের মধ্যে আলোক-চাপের সম্বন্ধে আর কোন নূতন কথা শুনা যায় নাই। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই উপেক্ষিত জটিল বিষয়টি সুবিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক প্রেষ্টনের (S. T. Preston) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বহু গবেষণায় ইনি দেখাইলেন, এন্‌জিনের চাকার সহিত চামড়ার ফিতে জুড়িয়া যেমন কলের শক্তি স্থানান্তরে চালনা করা যায়, আলোকরশ্মি দ্বারাও সেই প্রকারে আলোকোৎপাদক স্থানের শক্তি ঈথরের সাহায্যে

আলোকপ্রাপ্ত স্থানে পৌঁছায়। বন্দুক হইতে গুলি ছাড়িলে, সেটি যাহাতে আসিয়া লাগে তাহাকে প্রবল ধাক্কা দেয় এবং বহির্গমনকালে বন্দুকের পিছন দিকেও একটা ধাক্কা দিয়া থাকে। কোন বস্তু হইতে আলোক নির্গত হইতে থাকিলে বন্দুকের গুলির ন্যায় তাহা যে, আলোকপ্রদ ও আলোক-প্রাপ্ত উভয় অংশকেই ধাক্কা দেয়, প্রেষ্টন্ সাহেব তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছিলেন। সূর্য্য আমাদের জগতের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ আলোকপ্রদ বস্তু, প্রতি মুহূর্ত্তেই ইহা হইতে যে, কত আলোকরশ্মি বাহির হইয়া চারিদিকে ছুটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। প্রেষ্টন্ সাহেব সূর্য্যের বিকিরণশক্তি গণনা করিয়া আলোকপ্রক্ষেপণজনিত কত চাপ তাহাতে পড়ে, তাহার একটা হিসাব দেখাইয়াছিলেন।

শত বাগ্‌বিতণ্ডায় যে সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, অনেক সময়ে গণিতের দুই একটি সাধারণ সূত্রের সাহায্যে সকল তর্ক-যুক্তির খণ্ডন হইয়া নিখুঁৎ সত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়া পড়ে। নানা বিজ্ঞানের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমরা গণিতের এই কার্য্য দেখিতে পাই। গণিতসিদ্ধ প্রমাণ প্রয়োগ করিলে, তাহার উপর সন্দিহান হইবার আর কোন কারণই থাকে না। আজ কাল যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হইতেছে, তাহার অধিকাংশই গাণিতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। ইহা দেখিয়া আলোক-চাপের কথা প্রচারিত হইবামাত্র শিক্ষিত জনসাধারণ তাহার অস্তিত্বের গাণিতিক প্রমাণ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই প্রমাণসংগ্রহের ভার অধ্যাপক লার্মর্ (Prof. Larmor) গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু পরিশ্রমের পর তিনি এক গণিত-সম্মত প্রমাণেরই সন্ধান পাইয়াছিলেন। বিদ্যুৎ, তাপ, চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতির নানা শক্তি যখন ঈথরে নানা প্রকারের তরঙ্গ রচনা করিয়া প্রধাবিত হয়, তখন তদ্দ্বারা যে, চাপের উৎপত্তি হওয়া সম্ভাবনা, তাহাও অধ্যাপক লার্মরের গবেষণার ফলে এই সময়ে জানা গিয়াছিল।

তিনি দেখাইলেন,—কোন বস্তু আলোক বিকিরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলে তাহাতে আলোকপ্রক্ষেপণজনিত যে চাপ পড়ে, তাহা নিশ্চল অবস্থার আলোকপ্রক্ষেপণ চাপ অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু আলোক বিকিরণ করিতে করিতে জিনিষটা পিছাইতে থাকিলে তাহাতে যে চাপ পড়ে, তাহার পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত চাপ অপেক্ষা অনেক কম। কেবল তাপবিকিরণকালীনই যে, সচল পদার্থে চাপের এই প্রকাব পার্থক্য হয়, তাহা নয়। আলোকপ্রাপ্ত হইতে হইতে যখন কোন বস্তু আলোকপ্রদ পদার্থের দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহাতেও আপতিত আলোক-চাপের ঐপ্রকার হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। *

আলোক-চাপ-সম্বন্ধীয় গবেষণা এক লার্মর্ সাহেবের চেষ্টাতেই শেষ হয় নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে লর্ড র‍্যালে ও ডাক্তার বার্লো বিষয়টি লইয়া নূতন পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পবীক্ষায় ইঁহারাও আলোক-চাপের অস্তিত্ব এমন প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এখন আর তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ডাক্তার বার্লো কোন বায়ুহীন কাচপাত্রে এক খণ্ড কাচ ঝুলাইয়া তাহার উপর সুকৌশলে আলোকপাত করিয়াছিলেন। আলোক কাচফলকের ভিতর প্রবেশ করিয়া ও তাহার মধ্যে দুই বার প্রতিফলিত হইয়া বহির্গত হইয়াছিল এবং কাচফলকটিও নানা প্রকারে বার বার আলোকের চাপ পাইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ডাক্তার বার্লো এই প্রকারে আলোক-চাপের পরিমাণ পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছিলেন।

আলোক-চাপের অস্তিত্ব ও তাহার পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবিষ্কৃত হইলে পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির উপর সূর্য্যালোক-চাপের বিশেষ

* অধ্যাপক লার্মরের গাণিতিক প্রমাণের আমূল বৃত্তান্ত এপ্রকার প্রবন্ধের বিষয়ীভূত হইতে পারে না বলিয়া এখানে কেবল তাহার উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইল।

কোনও প্রভাব আছে কিনা, স্থির করিবার জন্য কিছু দিন খুব আলোচনা হইয়াছিল। হিসাবে দেখা গেল, জিনিষের আয়তন যত বড় হয় তাহার উপরকার আলোকচাপের প্রভাবও তত অল্প হইয়া পড়ে। কারণ বৃহৎ পদার্থের মাধ্যাকার্ষণের (Gravitational Attraction) টান অত্যল্প আলোকচাপের তুলনায় এত অধিক হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন আলোকচাপের প্রভাব হিসাবের মধ্যেই আসে না। আমাদের পৃথিবীর গুরুত্ব বড় কম নয়, সুতরাং ইহার মধ্যাকর্ষণজনিত টান খুব বেশী, কিন্তু ভূপৃষ্ঠে পতিত সূর্য্যালোকের চাপ অতি অল্প, সুতরাং জ্যোতিষিক হিসাবে এই ক্ষুদ্র চাপের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিলেও কোন দোষ হয় না। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র পদার্থের উপরকার আলোকচাপের কার্য্য অগ্রাহ্য করা চলে না। জিনিষ যত ক্ষুদ্র হয়, তাহার মাধ্যাকর্ষণের টানও তত কমিয়া আসে সত্য, কিন্তু পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল (Area of the Surface) সেই অনুপাতে কমে না। কাজেই, জিনিষ ছোট হইতে আরম্ভ করিলে মাধ্যাকর্ষণের টান যে প্রকার কমে, তাহার উপরে পতিত আলোকের চাপ তদপেক্ষা অনেক ধীরে ধীরে কমিতে আরম্ভ করে এবং এই জন্য জিনিষ খুব ছোট হইয়া পড়িলে মাধ্যাকর্ষণ-তুলনায় তাহার আলোক-চাপেরই আধিক্য আসিয়া পড়ে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, মৃত্তিকাকণার ব্যাস এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ পরিমিত হইলে, সেটির মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি ও তাহার উপরে পতিত আলোকের চাপ অবিকল একই হইয়া দাঁড়ায়। জিনিষের আয়তন উহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইলে আলোকের চাপ মাধ্যাকর্ষণশক্তিকে পরাভূত করিয়া নিজের প্রভাব দেখাইতে আরম্ভ করে।

অনন্ত মহাকাশে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অতি ক্ষুদ্র জড়কণা দুর্লভ নয়। ধূমকেতুর পুচ্ছ প্রভৃতি অনেক জ্যোতিষ্কই কেবল ঐ প্রকার অতি সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ উহাদের উপরে আলোক-

চাপের কার্য্যসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। পাঠক অবশ্যই জানেন, ধূমকেতু নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার পুচ্ছ দেখা যায়। তার পর যখন সেটি সূর্য্য হইতে দূরে যাইতে আরম্ভ করে, তাহার পুচ্ছ তখন ক্রমে কমিয়া আসে এবং খুব দূরে গিয়া পড়িলে পুচ্ছ আর মোটেই দেখা যায় না। ধূমকেতুর এই পুচ্ছোৎপত্তির ব্যাপারটা আলোকচাপেরই কার্য্য বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধূমকেতুর পুচ্ছ ক্ষুদ্র জড়কণাময়। কিন্তু এই কণাগুলির মধ্যে সকলের আয়তন ও গুরুত্ব সমান নয়। ছোট বড় নানাপ্রকারের কণায় পুচ্ছ গঠিত। কাজেই, বড় কণাগুলির উপরে যে আলোকচাপ পড়ে, ছোটগুলি তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প চাপ পায়। এদিকে সূর্য্য-সামগ্রীর (Mass) অনুপাতে ছোট-বড় সকল কণাকেই এক সঙ্গে রাখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র কণাগুলির উপর আলোক পাড়য়া সূর্য্যের টানের বিপরীত দিকে প্রবল ধাক্কা দিতে থাকে। কাজেই, সূর্য্যের আকর্ষণে বৃহত্তর কণাগুলি তাহাদের সহিত ঠিক এক সঙ্গে চলিতে পারে না, কিছু পিছাইয়া পড়ে। এই প্রকারে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কণাময় জ্যোতিষ্কে পুচ্ছোদ্গম হয়। বড় বড় কণাগুলি ইহার মস্তকের দিকে অর্থাৎ সূর্য্যেব নিকটবর্ত্তী থাকে এবং ক্ষুদ্রতর কণাগুলির ক্ষুদ্রতার অনুপাতে ক্রমেই সূর্য্য হইতে দূরে গিয়া বৃহৎ পুচ্ছ রচনা করে।

শনি গ্রহের চারিদিকে যে অঙ্গুরীয়াকার বেষ্টনী (Belt) আছে, পাঠক অবশ্যই তাহার কথা শুনিয়াছেন। ছোটখাটো দূরবীণ্ দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে গ্রহটির চারিদিকে ঐ বেষ্টনীগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। গ্রহের সহিত এগুলি দৃঢ়সংলগ্ন নয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, চন্দ্র যেমন আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জড়কণাও একনির্দ্দিষ্ট পথ ব্যাপিয়া সেই প্রকারে শনিগ্রহের চারিদিকে ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে এবং সেই সূক্ষ্ম জড়কণা-আকীর্ণ পথকেই আমরা দূর হইতে শনির বেষ্টনীরূপে দেখিতে পাই। শনির বেষ্টনী একটি নয়। পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহার চারিদিকে তিন চারিটি বেষ্টনীকে সমতলে থাকে-থাকে সজ্জিত দেখা যায়। আলোকচাপের সাহায্যে আজকাল ঐ বেষ্টনীগুলির উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইতেছে। পৃথিবীকে আজকাল আমরা যে প্রকার শীতল ও জীববাসের উপযোগী দেখিতেছি, ইহার অবস্থা অতি প্রাচীনকালে কখনই এ প্রকার ছিল না। সূর্য্যের মত ইহা হইতে এককালে নিশ্চয়ই তাপালোক নির্গত হইত। বৃহস্পতি গ্রহটি যে, আজও পৃথিবীর মত শীতল হইয়া জীববাসের উপযোগী হয় নাই, তাহার অনেক লক্ষণ ত আমরা এত দূরে থাকিয়াও জানিতে পারিয়াছি। মনে করা যাউক, শনিগ্রহ যখন খুব উষ্ণাবস্থায় থাকিয়া তাপালোক বিকিরণ করিতেছিল, তাহার পরিভ্রমণপথে যেন তখন ধূমকেতুর উপাদানের ন্যায় কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম জড়কণা আসিয়া উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য. পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আবদ্ধ করিয়া চারিদিকে ঘুরিতেছে, এ অবস্থায় শনিও সেগুলিকে নিজের পরিবারভুক্ত করিয়া ঘুরাইতে থাকিবে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, শনির বেষ্টনী সম্ভবতঃ ঐ প্রকারেই সৃষ্ট হইয়াছিল এবং পরে সেই নানা আকারের কণাগুলির উপর শনির তাপালোকের চাপ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পড়িয়া গুরুত্ব অনুসারে সেগুলিকে আগাইয়া পিছাইয়া বহু বেষ্টনীর উৎপত্তি করিয়াছে।

সম্পূর্ণ।